

বৌ-রাণী

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান :—
মজুমদার লাইব্রেরী
১০৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।



মূল্য ১৲ এক টাকা।


প্রকাশক
শ্রীভোলা নাথ
দেব
মজুমদার
লাইব্রেরী
২৩, ঝামা পুকুর
লেন

১ম সংস্করণ


প্রিন্টার
শ্রীনুটবিহারি মজুমদার
মজুমদার প্রেস
১০৬ অপার চিৎপুর রোড।

উপহার

আমার দেশের ছোট বড়

সমস্ত

বৌ-রাণীদের

লজ্জাবিজড়িত কোমল করতলে

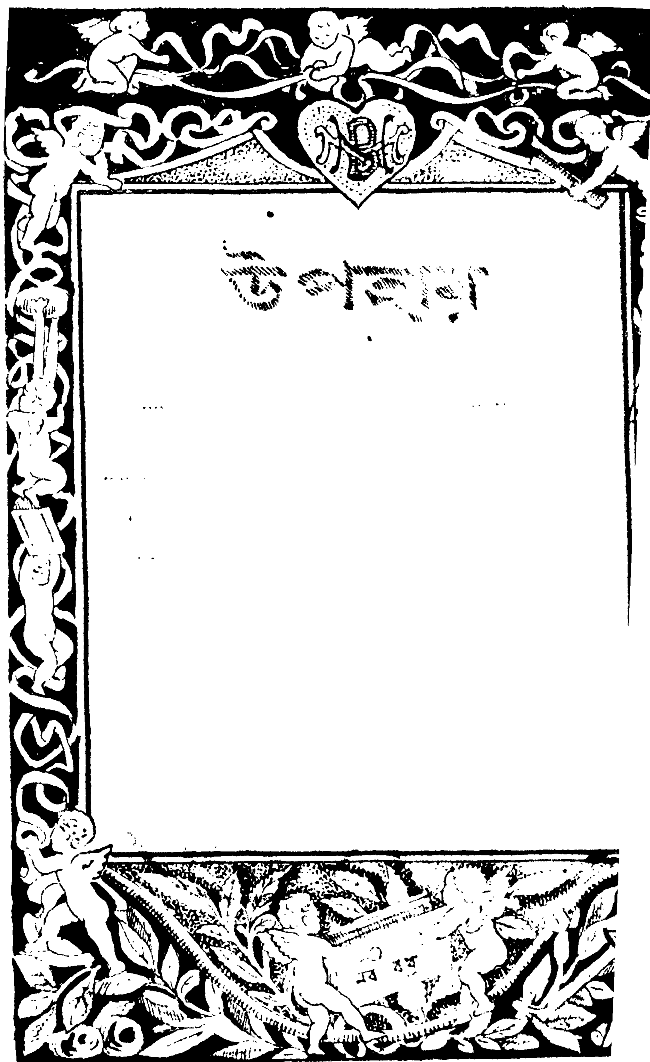
আমার এই

ক্ষুদ্র বৌ-রাণী

তুলিয়া দিলাম।

ইতি—

ভাদ্র, ১৩২৭ } শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।



উপহার



বৌ-রাণী



প্রথম পরিচ্ছেদ

সোণা-গাঁয়ের জমিদারের শ্রাদ্ধ—যথেষ্ট সমারোহ হইতেছে। স্বর্গীয় জমিদার হরকান্ত বসুর অগাধ বিষয় সম্পত্তির এবং শ্রাদ্ধের অধিকারী পুত্র নিখিলনাথ দেশের ভিক্ষুককে অকাতরে অর্থ এবং বস্ত্র দান করিয়াছেন। কেহই অস্বীকার করে নাই যে, এত বড় একটা শ্রাদ্ধ দেখিবার সৌভাগ্য পূর্ব্বে তাহাদের হইয়াছিল।

হরকান্ত বসু জীবদ্দশায় প্রভূত অর্থশালী হইলেও মনঃসুখে দিন কাটাইতে পারেন নাই। নিখিলনাথের দুশ্চরিত্রতার কথা গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেরই জানা ছিল। সে কচিৎ গৃহে আসিত। আসিলেও দুই একদিন থাকিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইত। হরকান্ত বসুর ইচ্ছা না থাকিলেও, পুত্রের খরচের খাতায় সমান

অঙ্কেই খরচ পড়িতে লাগিল। তাই অষ্টাত্তর বর্ষ বয়সে যখন বুকে বেদনা এবং কাশির সূত্রপাত দেখা গেল, তখন হরকান্ত বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কে তাঁহার মুখাগ্নি করিবে! তাঁহার পত্নী নিখিলকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া নিরাশার মধ্যে একটুখানি আশার সঞ্চার হইয়াছিল, হয়ত বা এত বড় একটা সংবাদে সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না। কিন্তু সংবাদ পাঠানোর দিন হইতে চারদিন চলিয়া গেল, তখন আর বৃদ্ধ কোনমতেই আশা পোষণ করিতে পারিলেন না। প্রতি প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আশার আলোক-রশ্মি কম্পমান বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত, আবার সন্ধ্যার ম্লান ধূসর ছায়াতেই তাহা মিলাইয়া যাইত। বড় দুঃখেই সৌদামিনী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, পুত্র আসিবেই। সে প্রার্থনা যখন বিফল হইল, তখন তিনি পুনরায় অন্য প্রার্থনা করিলেন—হে ভগবান, সাতজন্ম যেন বন্ধ্যা হই।

ভগবান কোন্ প্রার্থনাটি মঞ্জুর করিয়াছিলেন, জানি না। নিখিলনাথ দার্জ্জিলিঙ হইতে কলিকাতায় নিজের বাসায় ফিরিয়া যেমন পত্র পাঠ করিল, অমনই গাড়ী ডাকিতে বলিয়া দিল এবং বৃদ্ধের মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বদিনই বাড়ী আসিয়া হাজির হইল।

হরকান্ত বসুর মৃত্যুর পর যখন সৌদামিনী পুত্রকে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আর ত বাবা তোমায় আমি

ছেড়ে দেব না—" নিখিল অবিচলিত কণ্ঠে কহিয়াছিল—"না, মা, আর কোথাও যাব না।"

তাহার পর এক মাস কাটিয়া গেছে। ব্রাহ্মণ ভোজনের দিন অপরাহ্নে প্রায় সমস্ত কাজ কর্ম্মই মিটিয়া গেছে, বাহিরের ঘরে বসিয়া নিখিলনাথ একটা কি খাতা দেখিতেছিল, নন্দ আসিয়া কহিল—মা ডাকিতেছেন।

নিখিলের জননী সৌদামিনী একটি সপ্তদশ বর্ষীয়া কুমারীর হাত ধরিয়া দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। নিখিল একবার মায়ের পানে, একবার এই অপরিচিতার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সৌদামিনী কহিলেন—একে তুই চিনিস্‌নে নিখিল, রাজীব সরকারের মেয়ে—অভয়া।

রাজীব সরকার কে, নিখিল তাহা জানিত এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে এই বিদূষী মহিলাই যে পিতার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইয়া সুচারুরূপে জমিদারী রক্ষা করিতেছেন, এমনই অনেক সংবাদ সে এই কয়দিন মধ্যেই শুনিয়াছিল।

সে বলিল—তুমি যে আস্‌বে, তা আমি কখনো ভাবি নি!

হঠাৎ যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, 'কেন ভাবে নাই, ইহা এমনই বা কি আশ্চর্য্য'—তাহা হইলে সে বড়ই ঠকিয়া যাইত, কিন্তু অভয়া কোন কথা বলিল না, সৌদামিনী কহিলেন—ও কি

আমার তেমনি মেয়ে। রাজলক্ষ্মী মেয়ে। নইলে এত বিষয়-আশয় কি পূর্ব্বের মত বজায় করে রাখ্‌তে পারে। না মা অভয়া, এতে লজ্জার কোন কথা নেই। এ কথা কি শুধু আমিই বলছি—দশটা গ্রামের লোক বলে কি না!…

অভয়া প্রশংসাবাদে বাধা দিয়া নিখিলকে বলিল—"এখন ত আপনাকে এখানেই থাক্‌তে হবে।"

নিখিল কোন কথা বলিবার আগেই সৌদামিনী বলিলেন—"না থাক্‌লে কি করে চলবে? এ সব দেখবে শুন্‌বে কে?"—কে ডাক্‌ছে, নন্দর মা, যাই বাছা যাই, একটু দাঁড়া মা অভয়া, আমি আস্‌ছি—বলিয়া তিনি নন্দর মার উদ্দেশে গমন করিলেন।

নিখিল ভাবিল, এই মুহূর্ত্তে সে বাহিরে চলিয়া যাইবে কিন্তু তাহা আর হইল না।

অভয়া জিজ্ঞাসিল—"আপনি এত দিন কলিকাতায় থাক্‌তেন, পড়তেন বুঝি?"

নিখিল হাসিল, বলিল—হাঁ। পাঁচবার এণ্ট্রেন্স দিয়েছি। এ বছরও দিতুম, তা' সরস্বতীর বরাতে নেই। বলিয়া সে হাসিল।

অভয়াও হাসিল, বলিল—একবারেও পাশ হলেন না?

নিখিল আবার হাসিল, বলিল—"হওয়াটা যদি আমার ইচ্ছার

উপরেই নির্ভর করত, সত্যি বলছি তোমাকে, একবারের বেশী দু'বার হতে দিতুম না। দেখা গেল, সেটা সম্পূর্ণই নির্ভর করে, অন্য অনেক লোকের হাতে।”

একটু থামিয়া আবার হাসিতে হাসিতে বলিল—দেখ, কতক-গুলো লোক থাকে, কেবল পাশই করে, ফেল করে না। আর কতকগুলো লোক আছে, ঠিক তার উল্টো। দু'দলেরই দুর্ভাগ্য কিন্তু সমান।

অভয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—দুর্ভাগ্য!

নিখিল হাসিমুখে বলিল—নিশ্চয়। দেখ, যারা পাশ করছে, তারা ফেল করার এক্সপিরিএন্স, বাঙলায় কি বলে ছাই—অভিজ্ঞতা, বড্ড বড় কথা হোল, তা হোক গে—অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত, আবার পাশ করার যে এক্স—

বলুন, আমি বুঝতে পারছি।

নিখিল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। অভয়া অবনতমুখে কহিল—আমি এণ্ট্রেন্স দিয়েছিলুম।

পাশ হয়েছিলে নিশ্চয়?

হাঁ। বলিয়া সে মাথাটা আরো নীচু করিল।

বা, চমৎকার!—বলিয়া নিখিল প্রশংসমান-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল। মেয়েটি মুখ তুলিতেই নিখিলের হাসিমুখ দেখিয়া সেও অকারণে হাসিয়া ফেলিল।

সৌদামিনী আসিয়া বলিলেন—এসো মা-লক্ষ্মী, তোমাকে পাল্কীতে দিয়ে আসি।

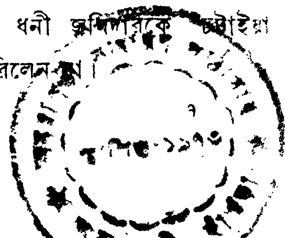
শুভ্র দুই হস্তে নিখিলনাথকে নমস্কার করিয়া অভয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ অন্য দ্বার দিয়া নিখিলনাথ বাহিরে গিয়া একটা চুরুটে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অভয়া যেন সৌদামিনীকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। এত রূপ, এত ধনৈশ্বর্য্য স্বত্বেও মেয়েটির মনে যে একটুও তমঃ নাই, তাহা কত প্রকারেই না তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, সেই অসামান্যা সুন্দরী পিতৃ পরিত্যক্ত সুবিশাল জমিদারী কেমন সুচারুরূপে রক্ষা করিতেছে, এটা ভাবিতেও সৌদামিনী আত্মহারা হইতেন।

এইখানে পূর্ব্ব ইতিহাস একটু না বলিলে চলিতেছে না। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজীব সরকারের পত্নীবিয়োগের সময় মেয়েটিকে লইয়া একটু গোলে পড়িতে হইয়াছিল। রাজীবপুরের ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ পঞ্চদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কুমারীর মাতার শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইতে একেবারেই নারাজ হইয়াছিলেন, তখন সৌদামিনী রাজীব সরকারের গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া আসায় ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাশাপাশি দুই খানি গ্রামের দুইটি ধনী জমিদারকে চটাইয়া রাখা সজ্জনগণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না।



তাঁহারা রাজীব সরকারের গৃহে পাতা পাতিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজীব অনর্থক কতকগুলো অকাল-কুষ্মাণ্ড ভোজন করাইতে রাজী হইলেন না। সজ্জনগণ বড়ই হতাশ হইলেন এবং তাহারই ফলে ছয় মাসের মধ্যেই রাজীব চক্ষু বুজিলেন।

সৌদামিনী পিতৃ-মাতৃ-হারা বালিকার নিকটে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্নে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতেও যে পূর্ব্বোল্লিখিত সজ্জনগণ সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা নয়, কিন্তু হরকান্ত বসুর কার্য্যের উপরে কথা কহিবে, এত বড় দুঃসাহস সে অঞ্চলে কাহারো ছিল না।

সেই দুই বৎসরে আগেকার দেখা মেয়েটি যে তাঁহার এত প্রিয় হইয়া উঠিবে, কোন দিনই তিনি তাহা ভাবেন নাই। কর্ত্তব্যের খাতিরে মাতৃহারা বালিকাকে সান্ত্বনা দিতে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, আজও বার বার সৌদামিনীর ইচ্ছা হইতেছিল, অভয়াকে কোলে তুলিয়া লন। অভয়াকে আপনার করিয়া লইতে যেন তাঁহার সমস্ত হৃদয়খানি হা হা করিতেছিল।

পরদিন সকালেই রাশিকৃত শাক-সব্জী মৎস্য মিষ্টান্ন লইয়া দশ বারো জন লোক সোণা-গাঁয়ের জমিদার-গৃহিণীর সম্মুখীন হইল, আনন্দে অধীর হইয়া, নিখিলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—জমিদারের মেয়ে বটে, নইলে এমন নজর হয়! যা'কে বলে মেয়ে! সে কি কোথায় কিছু খুঁত রাখবার মেয়ে! কাল নন্দর

মা পাল্কীর দরজা খুলে দিয়েছিল, হাতে অমনি দু'টো টাকা—"যাও বাছা, তোমরা একটু বিশ্রাম করগে, জলটল খেয়ে তবে যাবে।"

আগন্তুকদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া বলিল—আর এই ধুতি-চাদর, জুতো মা'ঠাকরুণ। বলিয়া একখানি পশমের খুঞ্চেপোষ ঢাকা সমেত নামাইয়া রাখিল।

নন্দর মা ঢাকা খুলিতেই একখানি সূক্ষ্ম লালপাড় ধুতি ও কোঁচান চাদর, এক জোড়া পশমের ফুলতোলা জুতা দেখা গেল।

দেখছিস্ নন্দর মা! মেয়ের আমার কত বিবেচনা দেখ। আজ নিয়ম ভঙ্গ, নিখিল আমার জুতো পরবে, এ'টি পর্য্যন্ত সে মনে করে রেখেছে। বলিয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে নিখিলের পানে চাহিলেন।

নিখিলও কতকটা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। বাহিরের ছাদে শীতের রৌদ্রে পিঠ রাখিয়া সেই কথাটাই ভাবিতে লাগিল। তাহার সমস্ত চিত্তই যেন উন্মুখ হইয়া কল্যকার সেই তরুণীর চিন্তাতেই মগ্ন হইতে চাহিল।

অসহ্য গোলমালের মধ্যে সারা দিনমান কাটাইয়া যখন সে একটু বেড়াইবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার অজ্ঞাতে তাহার চরণদ্বয় যে পথে তাহাকে চালাইবার উপক্রম করিল, তাহা বুঝিবামাত্র লজ্জায় রাঙা হইয়া সে ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভয়া কোনমতেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? প্রথম সাক্ষাতেই নিখিলনাথ তাহার সহিত যেরূপ ভাবে আলাপ করিয়াছে, অভয়া কতকটা আপনাকে অপদস্থ মনে করিতেছিল। অথচ এটুকুও সে না ভাবিয়া পারিতেছিল না যে নিখিল ইচ্ছা করিয়া তাহাকে অপমানিত করিতে 'তুমি' বলে নাই—তবে তাহার শিক্ষার যে প্রচুর অভাব আছে, ইহা সে স্থির বুঝিয়াছিল। যাহারা সোণা-গাঁ হইতে ফিরিল, শতমুখে সেখানকার প্রশংসা করিতেছিল, তাহাদের সম্মুখে আসিতেই, সে শুনিল—গিন্নী নিজে বসে থেকে খাওয়ালেন, একটু কিছু ফেল্‌বার জো নেই। খা বাছা খা, তোরা ভাল ক'রে না তিরোপ্ত হ'লে আমার ছেলের অকল্যাণ হবে।

হ্যাঁরে জিনিষপত্র দেখে কি বল্লেন?

ও-মা, সুখ্যাতি আর ধরে না। "অভয়া আমার রাজলক্ষ্মী মেয়ে ইত্যাদি।"

বাবু—বাবু কিছু বল্লেন?

না। তিনি বড় গম্ভীর লোক দেখনু।

কিচ্ছু বল্লেন না?

না। শুধু একবার বাড়ীর ভেতর এসেছিলেন, মা'কে বল্‌লেন—মা, অভয়ার লোকজনকে বিদায় করতে সরকার মশায়কে বলে দিয়েছি।

এই টুকু শুনিয়াই অভয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল, নিখিল যে আজো সকলের সমক্ষে তাহাকে অভয়া বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, ইহার জন্য একদিকে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না, আবার সেই সম্মানটুকুর আঘাতের দুঃখও তাহার কম হইল না।

সমস্ত দিন কাজকর্ম্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকিয়াও, অভয়ার বার বার এই ক্ষুদ্র আঘাত এবং পুলকের ভাবটুকু স্মরণ হইতে লাগিল। সন্ধ্যার কিছু পুর্ব্বে ছাদে উঠিতেই সোণা-গাঁয়ের খালের উপর একখানি ক্ষুদ্র তরণী দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। একে ত সে খালে কোন দিনই নৌকা চলিত না, তাহার উপর কয়েকজন ভদ্রবেশধারী যুবক দেখিয়া স্বতঃই তাহার মনে হইল, এ নিখিল নাথের দল। সোণাগাঁয়ের পশ্চিমপ্রান্তে ভাগিরথী হইতে খাল কাটিয়া চাষের সুবিধার জন্য স্বর্গীয় জমিদার হরকান্ত বসু এই খাল কাটিয়া দিয়াছিলেন। খালটি সোণাগাঁ বেষ্টন করিয়া পুনরায় গঙ্গায় মিলিত হইয়াছিল, কাজেই বৎসরের সমস্ত সময়ই ইহাতে

প্রচুর জল থাকিত। আজ হঠাৎ সেই খালে নৌকা চলিতে দেখিয়া অভয়া বিস্মিত হইয়াছিল, তাহার অট্টালিকার নিম্নদিক দিয়াই খাল প্রবাহিত। প্রশ্ন করিয়া জানিল, সোণাগাঁর জমিদারেরই বল বটে। এই ক্ষুদ্র খালে নৌকারোহণে কি আনন্দ লাভ করা যাইতে পারে, সে কিছুতেই তাহা ভাবিয়া পাইল না। অল্প দূরে ভাগিরথী প্রবাহিতা, জলভ্রমণের পক্ষে সেই ত অত্যুত্তম স্থান। কিন্তু একটা কথা মনে আসিতেই সে চমকিত হইয়া উঠিল। অস্তগামী সূর্য্যের লাল-রশ্মি তাহার মুখখানা একেবারে রাঙা করিয়া দিল।

প্রভাতে সে নিজের ঘরে বসিয়াছিল, ভৃত্য সংবাদ দিল, একটি বাবু এসেছেন, বল্‌ছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

কি একটা অজানা শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া অভয়া বলিল—রমেশ বাবুকে খবর দিয়েছিলি ?

তিনি বল্লেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবেন—

তা হোক্, তুই রমেশবাবুকে ডেকে দে'—

ভৃত্য প্রস্থানোদ্যত হইলে, সে জিজ্ঞাসিল—হাঁরে, কি রকম বাবু ?

ভৃত্য বলিল—মস্ত লম্বা চওড়া, খুব ফরসা, মাথা নেড়া—

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই অভয়া আসন ছাড়িয়া উঠিল। বলিল, বাবুকে বসবার ঘরে এনে বসা, আমি যাচ্ছি।

এই মুণ্ডিত-মস্তক গৌরবর্ণ দীর্ঘায়তন পুরুষ যে নিখিলনাথ ছাড়া কেহই হইতে পারে না, ইহা অভয়া বিশেষ করিয়া বুঝিল। তাড়াতাড়ি বেশের সামান্য পারিপাট্য সাধন করিয়া বসিবার ঘরে চলিল।

আগন্তুক দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া একখানি ছবি দেখিতেছিল। অভয়া শিহরিয়া উঠিল, নিখিলই ত!

ঘরে ঢুকিতেই আগন্তুক ফিরিয়া দাঁড়াইল, অভয়া নমস্কার করিতেই হাসিয়া বলিল—আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।

অভয়া কিছু বলিল না। নিখিল তাহার হস্তস্থিত চাবুকটি টেবিলের উপর ফেলিয়া কহিল—তুমি কি ব্যস্ত ছিলে?

অভয়া বলিল—না।

নিখিল বলিল—আমিও ত তাই ভাবি। সকালবেলাটা কারো ব্যস্ত থাকা ভারি অন্যায়। যখন আমি স্কুলে পড়তুম, সকাল-বেলাটা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটাতুম, ভারি ভাল লাগতো আমার। যাহারা বই খুলে ঘড়র ঘড়র করে—বলিয়া সে উচ্চহাস্য করিল।

অভয়া হাসিল, কিন্তু কথা কহিল না।

নিখিল বলিল—তুমি হয় ত ভাবছ, এই জন্যই পাঁচবারেও আমি এণ্ট্রেন্স পাশ করতে পারিনি—

অভয়া লজ্জিত হইয়া বলিল—না, না, তা আমি মনে করিনি।

নিখিল কহিল—করনি, আশ্চর্য্য! সে পুনরায় হাসিল।

অভয়া বলিল—আপনি চা-টা খাবেন কি?

নিখিল হাসিয়া বলিল—ও জিনিষটায় কখনই আমার অরুচি নেই।

ঘণ্টা বাজাইবামাত্র ভৃত্য উপস্থিত হইলে, তাহাকে চা আনিতে বলিতেই নিখিল বলিল—তুমি খাবে না? সে হবে না! যদিও আমি অতিথি, তবুও—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অভয়া ভৃত্যকে দুই পেয়ালা আনিতে বলিয়া দিল।

অভয়া জিজ্ঞাসিল—আপনার এ সব কেমন লাগছে?

নিখিল হাসিয়া কহিল—পাঁচবারের বারেও এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার প্রতি আমার তেমন শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা কিছুই ছিল না—

অভয়া বলিল কেন আপনি বার বার ঐটারই উল্লেখ করেন বলুন ত!

আবার সেই হাসি। অভয়ার মনে হইতে লাগিল, লোকটি কি হাসিতেই সৃষ্টি হইয়াছে!

নিখিল বলিল—আহা আমার যেটা বিশেষত্ব সেটা আমি প্রকাশ করব না?

অভয়া বলিল—সামান্য দিনের ভেতর আপনার যে রকম সুনাম রটেছে, আমি নিশ্চয় বলতে পারি, আপনি—

বাধা দিয়া নিখিল কহিল—সুনাম রটেছে? কি! আমি মদ খাই মাতাল প্রভৃতি—

অভয়া আরক্তমুখে চুপ করিয়া রহিল। ক্রোধে, বিরক্তিতে তাহার যেন কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

নিখিল হাসিয়া বলিল,—তুমি রাগ করলে! বাস্তবিক আমার অন্যায় হয়েছে। এমন করে কথাটা আমি বলতে চাই নি! কিন্তু, এ ক্রটী ক্ষমা করাই উচিত, জানই ত, আমার শিক্ষার দৌড় ঐ পাঁচবার। বলিতে বলিতে সে হাসিয়া ফেলিল।

অভয়াকে নীরব দেখিয়া, নিখিল বলিতে লাগিল, দেখ মানুষের দোষ ক্রটী যদি খুঁজে বেড়ান যায়, তার সংখ্যা থাকে না। আরো একটা কথা কখনো আমার কোন কথা আমি কারু কাছে গোপন রাখতে পারি নি। তুমি যেমন বল্লে—সুনাম রটেছে, আমার মনে পড়ে গেল, আমি যে একটু আধটু মদ খাই, সেইটাই হয়ত তোমার কাণে গেছে, তুমি বিরক্ত হয়েছো।

কথাটা কাণে যাইতেই অভয়ার কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল, সে ভাবিল, বলি ইহাতে আমার বিরক্তির কারণ কি থাকতে পারে?—কিন্তু বলিল না।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নিখিল বলিল—তুমি রাগ করো না অভয়া!—বলিয়া নিবিষ্টচিত্তে চা পান করিতে লাগিল। শেষ করিয়া বলিল—একবার আমাকে বাইরে যেতে

বৌ-রাণী

কথার পা আছে দেখছি—বলিয়া নিখিল সোজা হইয়া দাঁড়াইল; বলিল—চল্লুম, অনেক বিরক্ত করলুম কিছু মনে করো না।

অভয়ার মন বলিল, এমনতর বিরক্তি তাহার কাছে চিরদিন প্রার্থনীয়। আস্তে আস্তে নমস্কার করিয়া বলিল—আপনি ঘোড়ায় এসেছেন বুঝি?

হাঁ—বলিয়া নিখিল বাহির হইয়া গেল। অশ্বপদ-শব্দে চমকিত হইয়া অভয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। বার বার করিয়া নিখিলের হাসিটাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। এবং স্বপ্নাবিষ্টের মত এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল—লেখাপড়ার গর্ব্ব না থাকিলেও সারল্যের গর্ব্ব উহার যথেষ্ট আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাজীৎপুর হইতে ফিরিবার পথে একটা স্থানে অসংখ্য জনসঙ্ঘ দেখিয়া নিখিল ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল। ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ভিড়ের নিকটে আসিয়া বুঝিল, হাট বসিয়াছে।

ইহা সোণাগাঁয়ের হাট। সপ্তাহে দুই দিন বসে। আশে-পাশের বিশ পঁচিশখানা গ্রামের দ্রব্যাদি এখানে ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে।

যে ঘটনাটি প্রথমেই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহা এই ;—একটি গৌরবর্ণ, শীর্ণকায় বালিকা কয়েকটা পাকা পেঁপে বেচিতে আনিয়াছিল, জমিদার-তরফের পাইক তাহার মধ্যে ভাল দুইটি বাছিয়া 'তোলা' তুলিয়া লইয়াছে; বালিকা ক্রন্দন করিতেছে। জমিদার-তরফের লোক সমস্ত বিক্রেতার নিকট হইতেই 'তোলা' তুলিতেছিল, বালিকার আপত্তি নেহাৎ ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্য বুঝিয়া প্রথমে একটা লইয়াছিল, শেষে দুইটা তুলিয়া লইল। বালিকা কাঁদিয়া বলিতেছিল, "মোর বাবা জ্বরে পড়েছে, মা তাই ফল কটা বেচে ডাকতারের ওষুধ আনতে বলেছ্যেলো"—ইত্যাদি। অবশিষ্ট তিন-চারিটা ফল বিক্রয় হইতেই

সে ছলছল-নেত্রে পেতেটি বগলে তুলিয়া লইয়া বাজার হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিখিল ভিড়ের মধ্যেই ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল, প্রথম মুহূর্ত্তে কাহারো পা, কাহারো পিঠে আঘাত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার এই দুঃসাহসিকতায় জনগণমধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইল, হঠাৎ জমিদারের পাইক আভূমি প্রণাম করিতেই অশ্বারোহী যে কেষ্ট-বিষ্টুর কেহ, এ ধারণা সকলেরই কম বেশী হইয়া গেল। অশ্বারোহী হাট পার হইয়া গেলে, লোকে যখন শুনিল, সে-ই সোণাগাঁয়ের নূতন জমিদার, তখন জলন্ত আগুনের উপর ছলাৎ করিয়া জল ঢালিয়া দিলে যেমন হুস্‌ করিয়া শব্দ হইয়া সব নিঃশেষ হইয়া যায়, তেমনি আন্দোলন-টা একেবারেই লোকের গলার মধ্যে জমাট বাঁধিয়া গেল।

বালিকার নিকটে উপস্থিত হইয়া সে জিজ্ঞাসিল, জমিদারের লোক তোমার পেঁপে কেড়ে নিয়েছে?

সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—হ্যাঁ গো। দু'টো, সব চেয়ে ভালো দু'টো। আমার—

নিখিল বলিল,—বেচলে সে দু'টোর কত দাম হত?

দু'তিন গণ্ডা পয়সা ত হ'ত। আমরা তোলা ফি হাটেই দিই গো। এবার আমার বাবার অসুখ, আর পোড়ারমুখো জমিদারের লোক—

আমিই সেই পোড়ার-মুখো জমিদার। এই নাও তোমার পেঁপে দু'টির দাম।

সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে চাহিয়া রহিল, না পাতিল হাত, না বলিল কথা।

নিখিল বালিকার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া টাকাটি গুঁজিয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিল—জমিদারকে গা'ল দিও না, কেউ শুন্‌লে ধরে নিয়ে যাবে।—বলিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

বালিকা সেইখানে বসিয়া জমিদারের পাইক এবং তাহার মনিবকে একসঙ্গে বহুবিধ প্রিয়-সম্ভাষণ করিয়া গৃহে চলিয়া গেল।

সেইদিনই অপরাহ্নে পথে ঘাটে জমিদার স্বাক্ষরিত প্ল্যাকার্ড গ্রামের চতুর্দ্দিকে এবং হাটের গাছে গাছে ঝুলিতে লাগিল। আগামী হাট হইতে 'তোলা' বন্ধ হইয়া যাইবে।

মা বলিলেন,—হ্যাঁরে নিখিল, এ যে জমিদারের মান! একি বন্ধ হয়?

ছেলে হাসিয়া বলিল—একটুখানি পুঁচ্‌কে মেয়ে, পোড়ার-মুখো জমিদারের কেমন মান রাখ্‌তে রাখ্‌তে বাড়ী যাচ্ছে, সকালে যদি দেখ্‌তে মা—

মা কিন্তু বুঝিলেন না। বলিলেন, সংসারের একটা মস্ত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

ছেলে তাহা পূরণ করিবার ভার লইল। পরদিন ঢোল বাজাইয়া

জমিদারের আদেশ জারী হইল, এক ছটাক জমিও যে করে, বছরে দু'বার তা'কে জমিদারের খাল-ধারের চড়ায় বেগারে লাঙ্গল চষিয়া দিতে হইবে।

প্রজারা নায়েব গোমস্তার নিকট যে সংবাদ শুনিল, তাহার চুম্বক এই,—

জমিদার প্রজার ক্ষতি হয় বুঝে 'তোলা' নেওয়া বন্ধ করেছেন। তা'তে প্রজাদের যেমন সুবিধে হয়েছে, জমিদারের তেমনি জিনিষ-গুলোর অভাব হয়েছে। তাই তিনি খালের দুই ধারে সমস্ত রকম ফসলের চাষ করবেন। তাঁর সমস্ত প্রজা সুবিধামত দুই দিন ক'রে চাষ দিয়ে যাবে। এর নড়চড় হ'তে পারবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নূতন জমিদারের নাম করিতেই লোকের মনে যে একটা মহা ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা লুপ্ত হইল। যাহারা শুনিয়াছিল, সে মাতাল এবং অত্যাচারী, তাহারা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গ্রামের নেত্য সাহা কলিকাতা হইতে দুইটা বিলাতী কেস্ লোকের মাথায় চাপাইয়া জমিদার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, ইহাও যেমন পথে ঘাটে সকলের কাণেই গিয়াছিল, হাতকাটা নারাণ মণ্ডলের মেয়েটির প্রতি স্বয়ং জমিদারের ব্যবহারটাও তেমনি তাহাদের গোচর হইয়াছিল। দেশের চারি দিকে একটা সভয়-সশ্রদ্ধ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল।

আসলে জমিদারটির কিন্তু কোন দিকেই খেয়াল ছিল না। সকালে বৈকালে প্রত্যহ নিয়মিত খালের ধারে ঘুরিয়া বেড়ায়, চাষ-বাস দেখে, সন্ধ্যার পর চারজনে মিলিয়া তাস খেলে। দু'চারটা সোডার বোতলও সে সময় যে না ফাটে, এ কথাও বলা যায় না।

এমনি করিয়া দিন কাটে। যাহাকে লইয়া একটা বিষম সাড়া পড়িয়া গেছে, সে বাস্তবিক নির্ব্বিকার। একদিন প্রভাতে উঠিয়া শুনিল, একটা খুনী মোকর্দ্দমার তদন্তে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সাহেব বাজীৎপুরে আসিতেছেন। শুনিয়াই সে বাহির হইয়া পড়িল।

অভয়ার বাটী পৌছিয়া শুনিল, সে দ্বিতলে আছে—এ সময়ে সে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। বাহির হইতে শুনিল, অভয়া কাহার সহিত কথা কহিতেছে।

আস্‌তে পারি কি—বাহির হইতেই এই প্রশ্ন করিয়া নিখিল হাতের ছড়িটা দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিল।

এই শব্দেই অভয়ার অন্তঃস্থল ফুলিয়া উঠিল। সে বাহিরের দিকে চাহিতেই, রমেশ বাবু আসন ছাড়িয়া জিজ্ঞাসিলেন—কে?

ঘরের মধ্যে পা ফেলিয়া নিখিল সহাস্যে কহিল, আমি।

আসুন—বলিয়া অভয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমেশ বাবু, "আপনাকে কথনো দেখিছি বলে—"

অভয়া নিখিলকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল—হঠাৎ যে এত সৌভাগ্য হবে—

নিখিল হাসিয়া বলিল—শুনলুম, রাজা তোমার অতিথি। তুমি ছেলে-মানুষ, রাজ-অতিথির ভার-বহন করতে একা যদি না পার, তাই এলুম।

তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে অনেকখানি অভয়ের সাড়া পাইয়া অভয়া গাঢ়স্বরেই বলিল—আমিত ভেবেই পাচ্ছিলুম না যে, কেমন করে' এ ভার নামাব। আমার মাসতুতো ভাই, এই রমেশ বাবু, ইনি বল্‌ছিলেন, সাহেবদের ক্যাম্পে ভেট্ পাঠিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু আমার ত ভয় হয়, রাজপুরুষেরা পাছে সেটাকে আমাদের উপেক্ষা বলেই মনে করেন।

নিখিল বলিল—তোমার সন্দেহই ঠিক। হাসিয়া আবার বলিল—রাজার জাত, যতটা সম্ভব, খাতির যত্ন করা দরকার। তা' আমার উপরেই সে ভার দাও।

তাহার ভার বহন করিবার ক্ষমতায় অভয়ার অসীম বিশ্বাস ছিল, বলিল—বাঁচালেন আপনি, নিখিল বাবু।

আগন্তুকের পরিচয়ের আভাস পাইয়াই রমেশবাবু বলিয়া উঠিলেন—আপনি কেন ওঁদের সোণাগাঁয়ে ইন্‌ভাইট্ করুন না।

নিখিল উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল; বলিল, এই দেখুন, আপনার কতখানি ভুল! যেচে সৌহার্দ্দ্য করতে নেই, বিশেষ ও জাতের সঙ্গে। হ'য়ে যায়—নাচার। তাঁরা যদি সোণাগাঁয়ে আস্‌তেন, আমাকে সবই কর্‌তে হ'ত।

রমেশ বাবুর প্রথম ইচ্ছা ছিল যে, সাহেবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে কিন্তু নানানদিক ভাবিয়া নানান্ ক্রটীর ভয়ে সে ইচ্ছা

ত্যাগ করিয়াছিলেন। খরচের দিকটা যে না ভাবিয়াছিলেন, তাহা নয়। এখন সেই কথাই তুলিলেন।

তাহাতে অভয়া বাধা দিল।

নিখিল ঘড়ির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসিল, তাঁরা কখন্ পৌঁছিবেন ?

বৈকালে।

বেশ, আমি প্রস্তুত হ'য়েই আসব। এখন চল্লুম বেলা অনেক হ'য়েছে।—বলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। অভয়ার ইচ্ছা হইল, তাহাকে আরো দু'টা কথা বলে, কিন্তু পারিল না।

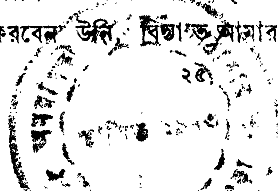
রমেশবাবু যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন, বলিলেন, একটা কেলেঙ্কারী না করে ছাড়বে না, দেখছি।

অভয়া বিস্মিতের মত কহিল—কেলেঙ্কারী হবে কেন ?

রমেশবাবু কহিলেন, কেন তা দেখে নিও। ঐ মাতালটার কথায় তুমি যেমন ভিজে গেলে। আমার কিন্তু কোন দোষ নেই, তা আগে থেকেই বলে রাখ্‌ছি।

অভয়া বলিল—"কিছু ভাবতে হ'বে না, রমেশদা'। ওঁকে আমি জানি। যথেষ্ট শক্তি না থাক্‌লে উনি ভার নিতেন না।

রমেশ বাবু বলিলেন জানি গো জানি। বাপের পয়সা থাক্‌লেই হয় না। সাহেবদের যে অভ্যর্থনা করবেন উনি, বিস্তারিত আমার



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাল অনেক রাত্র অবধি ছেলে গৃহে ফিরে নাই এবং কখন আসিয়া বাহিরেই শয়ন করিয়াছে, সৌদামিনী তাহা না জানায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রভাত হইবামাত্র বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মুখ হাত ধুইয়া নিখিল চা খাইতে বসিয়াছে। শুনিলেন, অভয়ার বাড়ী ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছিলেন, নিখিল সেখানেই ছিল। এই সংবাদে তিনি প্রীতা হইলেন।

সৌদামিনী পুত্রকে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় যথেষ্ট সাবধানে থাকিতে বলিয়া এবং কোন কারণেই অধিক রাত্রি অবধি বাহিরে থাকিয়া ঠাণ্ডা না লাগাইতে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন ম্যাজিষ্টর খুসী হ'য়েছে ত!

হয়েছে বৈ কি মা!

তা হবেই ত! অভয়া কি সেই মেয়ে!—অভয়ার রূপ গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"লোকে কত কথাই না বলেছিল, ওরা বেহ্ম; কে এক মাসতুতো ভাই এসেছে, ওদের নাকি ভাই-বোনে বে হয়, সেই মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে অভয়ার বিয়ে হবে। আমি কিন্তু একটাও বিশ্বাস করি নি। হ'লেই

বা বেহ্ম, একটা ধর্ম্ম ত। ধর্ম্ম কি কখনো 'ভাই-বোনে' বে' দিতে মত দিতে পারে? অভয়া মাসীর বাড়ীতেই থেকে পড়ত কি না, তাই যখন বাপের মৃত্যুর পর এল, ওর মাসী বুদ্ধি করে ছেলেটিকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিল,—দেখাশুনা করবে বলে।

নিখিল হাঁ না কিছুই বলিল না। সৌদামিনী বলিতে লাগিলেন—"লোকে যাই বলুক, আমার অমন একটি মেয়ে থাকলে বর্তে যেতুম। লোকের বলাবলিতে কার কি আসে যায়। আমি ত জানি, চন্দ্রসূর্য্য মিথ্যা হ'বার নয়, অভয়ার চরিত্রেও দাগ পড়া সম্ভব নয়। এত লেখাপড়া শিখে, অমন বংশে জন্মেও ও যদি হাড়ি মুচীর মত হবে, তবে যে সংসার মিথ্যে হয়ে যাবে। অমন মেয়ে কি আর হয়?"

নিখিল হঠাৎ স্বপ্নাবিষ্টের মতই ভাবিল, সত্যি, অমন মেয়ে কি হয়?

সে অনুশোচনায় মরিয়া যাইতে লাগিল, কাল রাত্রে তাহার নিকট কেন বিদায় লইয়া আসে নাই। বিদায় লইতে তাহার যথেষ্টই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর সে আর কোন রকমেই খাড়া থাকিতে পারে নাই। হয়ত অভয়া তাহাকে কি বিষম অভদ্রই না ভাবিয়াছে!

কিন্তু এই বিদায় বিস্মরণের ছলে আর একবার যাইতেও তাহার সাহস হইল না। একে ত পূর্ব্বেই যথেষ্ট অপরাধ হইয়াছে, এখন

এই সামান্য অনুযোগে তাহার সম্মুখীন হইয়া অপরাধের মাত্রা বাড়াইতে কোন মতেই সে রাজী হইতে পারিল না।

দিন আষ্টেক পরে, হঠাৎ একদিন অভয়ার ঘরে ঢুকিয়া—তুমি আমার সঙ্গে বিরোধ করতে চাও—অভয়া, বলিয়া নিখিল কঠোর দৃষ্টিতে অভয়ার পানে চাহিল।

অভয়া বসিয়াছিল, একখানি আসন দেখাইয়া দিল।

বস্‌তে আসি নি—আমি, তুমি আমার সঙ্গে বিরোধ করতে চাও? কেন? তাতে তোমার কি লাভ? আমি তোমার শত্রু নই, জ্ঞানতঃ তোমার কোন অপকারই আমার দ্বারা সাধিত হয় নাই।

হঠাৎ অভয়ার শুষ্ক কপোলটুকুতে তাহার নজর পড়িতেই সে বলিয়া উঠিল—না না, তুমি এত শুষ্ক কেন? তোমার কি কোন অসুখ হয়েছে?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়াই অভয়া জিজ্ঞাসিল—বলুন, কি বলছিলেন?

নিখিলের মনে হইল, তাহার তালুটা পর্য্যন্ত শুষ্ক নীরস। কহিল—তোমার অসুখ হ'য়েছে?

হ্যাঁ, কি বলছিলেন?

থাক্ সে আর একদিন বল্‌ব। কি হয়েছে—জ্বর?

হ্যাঁ।

কি চিকিৎসা হইতেছে, কত জ্বর বাড়ে ও কমে এই রকমের অনেক প্রশ্ন নিখিল করিল।

অভয়া বলিল—বিরোধের কথাটা কি বলছিলেন?

নিখিল সংক্ষেপে যাহা জানাইল, এই :—তিনি পূর্ব্বেই ঢোল সহরৎ দ্বারা প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত প্রজা বৎসরে দুইদিন করিয়া তাহার খালধারের জমিতে চাষ দিয়া যাইবে। এবং পালা ঠিক করিয়া দিবার জন্য তিনি প্রতি গ্রাম হইতে প্রবীন ব্যক্তি বাছিয়া মোড়ল নির্ব্বাচিত করিয়া দিয়াছিলেন। আজ অভয়ার দুইটি প্রজা কালীচরণ আর সেখ আবদুলের পালা পড়িয়াছিল। তাহারা কাজ করিতে গিয়াছিল, অল্পক্ষণ পরেই অভয়ার দ্বারবান প্রভৃতি গিয়া তাহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছে। তাহার নিজের লাঠিয়াল প্রভৃতি ছিল, কিন্তু সে বাধা দেয় নাই। তাহাতে তাহাকে যথেষ্ট অপদস্থ হইতে হইয়াছে।

অভয়ার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, অতি কষ্টে সে তাহা দমন করিয়া কহিল—"কিন্তু তারা ত আমার প্রজা।"

আহা! তারা আমারও জমি করে।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কথা কহিল না। অবশেষে নিখিলনাথ কহিল—"দেখ, এটা আমি করেছিলাম, তা'দেরই মঙ্গলের জন্য। হাটে তা'দের জমিদারকে তোলা দিতে অনেক ক্ষতি হ'ত, সেইটি তুলে দিয়ে এইটি করেছিলাম। শুধু তাই নয়, আমার

জমিদারীর মধ্যে সমস্ত প্রজার যে একটু স্বাধীনতা থাকে, তার জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করছি এবং করেওছি। ছোটখাটো অপরাধের জন্য তা'দের পুলিশ বা জমিদারের কাছারীতে ছুটতে হয় না—আমি মোড়ল ও পঞ্চায়েৎ বসিয়েছি এবং খুব গুরুতর মোকদ্দমা না হ'লে উপরে যেতে হয় না, তা'তে করে' তা'দের হায়রাণ এবং খরচ দু'টোই কমে গেছে।

আমি জানি। বলিয়া অভয়া নতনেত্রে মাটীর পানে চাহিল।

তা জানতে পার, কিন্তু কারণটি হয়ত তুমি অবগত নও। বাহিরে থেকে কেউ শুনলে স্বরাজ, স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি অনেক বড় বড় কথা ভাববে, তা আদৌ নয়। এতে আমার পরিশ্রম যে অনেক কমেছে, এইটেই আমি চেয়েছিলাম। প্রথম কতদিন কি ব্যতিব্যস্তই না আমাকে হতে হয়েছিল। এর ভেড়া চুরি, ওর ঘরে আগুণ, তার মাথা ফাটা—এমনি কত কি!—বলিয়া নিখিল হাসিতে লাগিল। অভয়া নীরবে সেই হাস্য প্রফুল্ল মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

একটু পরে হঠাৎ অভয়ার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল—"যাক্, তুমি যে আমার সঙ্গে বিরোধ করবে না, এতে আমি ভারি সন্তুষ্ট হ'লুম।

এক মুহূর্ত্তে অভয়ার সমস্ত মুখখানা রক্তে ভরিয়া গেল। সে কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না।

নিখিল বলিল—যাক্, এখন চল্লুম, আর একদিন এসে খবর নিয়ে যাব, তুমি কেমন থাক।

সে প্রস্থানোদ্যত হইলে অভয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কিন্তু আজকের ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারব না—সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে সেখানে দাঁড়াইয়া নিখিলও বাহির হইয়া পড়িল।

ঘটনাটা প্রথমে অভয়া বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু ইহাতে যে রমেশ বাবুর হাত যথেষ্টই আছে, সে কথা ভাবিয়াই সে রমেশ বাবুর সম্মুখীন হইয়া বলিল—তুমি দিন দিন এ সব কি করছ?

কি করছি? বলিয়া উষ্ণভাবে তিনি অভয়ার পানে চাহিলেন।

অভয়া কিছুই বলিতে পারিল না। ইচ্ছার প্রাবল্য স্বত্বেও সময় সময় যে মানুষকে এমন নীরব থাকিতে বাধ্য হইতে হয়, ইহার পূর্ব্বে সে কথাটা তাহার জানা ছিল না। কোন গতিকে প্রসঙ্গটা শেষ করিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

সে বলিল—না, না, এ রকম হ'তে পারবে না।

সংসারে এক ধরণের লোক আছে, যাহারা মৃদু আজ্ঞা ও সবিনয় অনুরোধগুলিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। রমেশবাবু এই ধরণের লোক। তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন, অভয়া সোণাগার

জমিদারের আদেশের প্রতিবাদ করাতে যথেষ্ট আপত্তি করিবে, কিন্তু যখন সে সব কিছুই ঘটিল না, তখন বিজয়-গর্ব্বে তিনি কৃতকর্ম্মের বাহবা দিতে তন্ময় হইয়া পড়িলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সামান্য জ্বরভোগের পর অভয়া সারিয়া উঠিতেই রমেশ বাবু কয়েকখানা চিঠি তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—যা ভাল বোঝ কর অভয়া, আমি আর মা'কে কিন্তু কিছু লিখতে পারব না।

অভয়া চিঠির উপর চোখ রাখিয়াই বুঝিল, তাহার মাসীমা লিখিয়াছেন, কলিকাতায় যাইতে। কলিকাতায় পাঁচজনের সঙ্গে মেলা মেশা না করিলে সংসার প্রবেশের পথ সুগম হয় না। আর সময় নষ্ট করাও উচিৎ নয়—প্রভৃতি কথাই সে দুই তিন মাস হইতে শুনিয়া আসিতেছে। শীঘ্রই যাইবে—শীত কমিলেই যাইবে, এই রকম করিয়াই অভয়া মাসীমাকে স্তোক দিয়া আসিতেছিল, মাসীমা এখন অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছেন।

একখানি পত্র বিশেষ করিয়া বাছিয়া লইয়া রমেশ বাবু অভয়ার হাতে দিয়া বলিলেন—এই খানা পড়ে দেখ।

সেইখানিতে তাঁহার জননী অভয়ার অবিবাহিতা থাকায় বিশেষ উদ্বেগ ও শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, অধুনা একটি সচ্চরিত্র যুবক তাঁহাদের ছাত্র সমাজের সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন। ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরক খণ্ড এবং

যথেষ্ট রূপবান। তাহাকে স্বামীত্বে বরণ করা যে কোন কুমারীর পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ছেলেটি ব্যারিষ্টারী করিতেছে, বিষয় আশয় রক্ষা করিতে যে এমনই একজনের সাহায্যের আবশ্যক, রমেশবাবুর বুদ্ধিমতী জননী সে ইঙ্গিতটুকুও করিতে ছাড়েন নাই। এবং প্রভাত যে অভয়ার অপরিচিত নহেন, ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে।

অভয়া চিঠিখানি পড়িয়া টেবিলে রাখিয়া দিল এবং বলিল—তুমি না পারো, আমিই মাসীমাকে লিখে দিচ্ছি, এখন কিছুদিন আমার যাওয়া হতে পারবে না।

রমেশবাবু বলিলেন—যাওয়া হতে পারবে না, তার মানে?

অভয়া সহাস্যমুখে কহিল—মানে কি যথেষ্ট সরল নয়?

এই হাস্য বিদ্রূপে রমেশবাবু অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন, মুখখানা হাঁড়ীর মত করিয়া বলিলেন—কিন্তু কারণটা কি?

অভয়া সহজ সুরেই বলিল—সুবিধে হবে না, যাওয়ার।

রমেশ বাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—কিন্তু মা যে ছেলেটির কথা বলেছেন, সে কি তোমার সুবিধে অসুবিধের জন্য বসে থাকবে?

অভয়া লজ্জা সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল—সারা বঙ্গদেশে আমিই ত একমাত্র কুমারী নই।

রমেশ বাবু আপন মনে বকিতে লাগিলেন—মার যেমন! আমি

সে কালেই বলেছিলাম যে শুধু স্কুলে পড়ে পাশ করলেই হয় না; মা ত তা বুঝলেন না। সেই সময় যদি ধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পারতেন, আজ অভয়া ধর্ম্মের দিক্ চেয়েও তাঁর কথায় অমত করতে পারত না।

অভয়া তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, সে চেষ্টাও তোমরা কম করনি ত! আমার জন্যই কৃতকার্য্য হও নি।

রমেশ বাবু বলিলেন—আমরা তোমার শত্রু?

আমি কি তাই বলছি।

রমেশ বাবু মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, আবার বলা কা'কে বলে? জান অভয়া, তোমার বাবা ব্রাহ্মধর্ম্মকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন।

পিতার উল্লেখমাত্রে অভয়া সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। বলিল—আমিও ত অশ্রদ্ধা করি নে রমেশ দা!

রমেশ বাবু বলিলেন—তিনি তোমার মার শ্রাদ্ধে ভূত ভোজন না করিয়ে পুষ্করিণী খনন করে, তাঁহারই মহিমময়ী নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

অভয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিল—সে কথা আমি ভালো জানি।—যদিও পিতার মনোভাবের সহিত যথেষ্ট পরিচিত হইবার সুযোগ তাহার হয় নাই, তথাপি তাহার মনে হইল, সর্ব্বতোভাবে এই ধারণাই সত্য। বলিল—যে অর্থ তিনি আমার মার শ্রাদ্ধে খরচ করতেন, সেই টাকাটা দিয়েই ক্ষীরপুকুর কাটিয়েছিলেন,—

লোকের পানীয় জলের কষ্ট দূর করবার জন্য। এর ভেতর তাঁর অন্য উদ্দেশ্য কিছুই ছিল না।

রমেশ বাবু চিঠিগুলা গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন—তোমার বাবা আমাদের সমাজের অরফ্যান ফণ্ড, সেবাশ্রম প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতেন।

তা আমি জানি।

কেন করতেন জান? তিনি আমাদের ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলেই।

আবার বাবার আয়ব্যয়ের খাতা দেখলে এটাও বুঝতে পারবে, হিন্দু, মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান—কোন ধর্ম্মীর কোন সৎকার্য্যেই তিনি অর্থ সাহায্য করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

রমেশবাবু অভিভূতের মত কহিলেন—যাক্ ওকথা ছেড়ে দাও। মা'কে কি লিখব বল?

অভয়া অবিচলিত কণ্ঠে কহিল—লিখে দাও, আমার যাওয়ার সুবিধা হলে আমি বিলম্ব করব না।—বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

রমেশবাবুর ইচ্ছা হইল, টেবিলে মুখ রাখিয়া একটু কাঁদেন। শেষে মনে মনে বলিলেন—হায়, যদি মা সে সময় অভয়াকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইতেন, কি সুবিধাই হইত। উঃ কি ভুলই তিনি করিয়াছেন! বহুদিন হইতেই অভয়া নানারূপ ওজর আপত্তি

করিয়াই আসিতেছে, হঠাৎ আজ রমেশবাবুর চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল! তবে কি ইহার মধ্যে সেই মাতালটার ঝোঁক আছে না কি! না না তাহা হইতেই পারে না। তাহার মত শিক্ষিতা এবং ভদ্র ঘরের মেয়ে যে কখনো দুশ্চরিত্র মদ্যপের অনুরাগিনী হইতে পারে, ইহা একেবারেই অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব—তবে! সে নিশ্চয়ই আমাদের ধর্ম্মে আস্থা রাখে না! তাহাই সম্ভব। উপায় কি! উপায় কি?—রমেশবাবু উপায় উদ্ভাবন করিতে তৎপর হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রমেশবাবুর কাছে খুব জোরের সহিত প্রতিবাদ করিয়া আসিলেও, নিজের মনের ভিতরে অভয়ার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল, কেন সে এত আপত্তি করিল! মাসীমার বাড়ীতেই সে একরকম মানুষ হইয়াছে। সেখানে যে শুধু লেখাপড়া শিখিতেছিল, তাহা নহে, তাহার জননী জীবিতকালে, অভয়া মাসীমার মেয়েদের সঙ্গে গান-বাজনা শিখিতে এবং রীতি-নীতি অনুসারে চলিতে পারে এমন দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুর পর তাহার পিতাও এ সকল হইতে তাহাকে বিরত করেন নাই। তাঁহার নিজের কি ইচ্ছা ছিল, বলা সুকঠিন, তবে তাঁহার নীরব অভিমতটুকু যেন পূর্ণ সম্মতি বলিয়া অভয়ার মনে হইতে লাগিল। আজ সে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে ভাবিয়া নিজেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অথচ কোনমতেই সায় দিতেও পারিল না।

এতদিন এ কথা সে ভাবে নাই, আজ চতুর্দ্দিক হইতে বন্ধনের যে প্রত্যক্ষ নিমন্ত্রণ আসিতেছে, তাহারই মাঝে দাঁড়াইয়া সে আপনাকে জাগ্রত রাখিয়া ভাবিতে লাগিল, ইহার কারণ কি!

রামহরি যখন হাসিমুখে কর্ত্রীকে সংবাদ দিতে আসিল যে

তাহাদের বাটীর অল্পদূরে বাঁধা ঘাটে ধাক্কা লাগিয়া সোণাগাঁর বাবুর ছিপ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে অভয়ার মুখ ছাইয়ের মত পাংশু হইয়া গেল।

সে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসিল—কখন রে?

এখনই মা। বাবুরা সব মদ খেয়েছিল কি না; এ ওর গায়ে পড়ছে, টল্‌ছে। সোণাগাঁর বাবু হাল ধরেছিল, সেও টল্‌ছিল, ছিপ বাঁধাঘাটে যেমন ধাক্কা লাগা—

খালে যথেষ্ট গভীর জল থাকে না, ডুবিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি উদ্বেগ আশঙ্কায় অভয়া জিজ্ঞাসিল—বাবুদের কি হল?

রামহরি বলিল—তিনজন উঠে পড়ল, আর জমীদার যে, সে একেবারে কুপোকাৎ। মোদের গাঁ থেকে পাল্কী খুঁজে তেনার জন্যে নিয়ে গেল।

অভয়া ধিক্কার দিতে চাহিল, কিন্তু কে যেন তাহার বক্ষ মধ্যে সহানুভূতির বন্যা বহাইয়া দিল। যখন পাল্কী লইয়া যাইতে হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি বিষম আহত হইয়াছেন। রামহরিকে সোণাগাঁয় পাঠাইয়া সংবাদ লইবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় হাসিমুখে রমেশবাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—শুনেছ অভয়া—

অভয়া তখনি বলিয়া উঠিল—শুনেছি। শুনেছি।

রমেশবাবু অবাক্। বলিলেন—এই রকমেই মাতালটা কোন্ দিন মারা পড়বে দেখ না।

অভয়া চুপ করিয়া রহিল।

রমেশবাবুর আশ্চর্য্য ধী-শক্তি। কহিলেন—ছোঁড়াটার সঙ্গে হেয়ার স্কুলে আমি এক বছর পড়েছিলুম কি না। তখনই স্কুলে আস্‌ত, মদ খেয়ে। আমরা কত বল্‌তুম। সে যা উত্তর দিত, শুন্‌লে কানে আঙুল দিতে হয়।

কিন্তু এই কানে আঙুল দিবার মত কথাটা শুনিবার জন্যই অভয়ার সোজা হইয়া উঠিল, কহিল—কি বল্‌তেন?

রমেশবাবু নাক মুখ সিট্‌কাইয়া কহিলেন—আরে ছিঃ, সে আবার শোনে!

অভয়া অল্পক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল—যাক্‌, বল্‌বার দরকার নেই। হ্যাঁ, মাসীমাকে তুমি লিখে দিও, বৈশাখ মাসের প্রথমেই আমি কল্‌কাতা যাব।

এই আশাতীত সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া রমেশবাবু কহিলেন, তুমি রাগ করলে অভয়া, আমি কথাটা বল্লাম না বলে। ও বল্‌ত, ছাড়ব যখন বে করব। তখন অন্য নেশা হবে কি না!

অভয়া আরক্তমুখে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, রমেশবাবু অন্যমনস্কভাবে মা'কে চিঠি লিখিতে চলিয়া গেলেন।

বিচারকের সমক্ষে দোষ স্বীকার করিয়া জেলখানার পথে চলিতে যেমন কোন উৎসাহই থাকে না, অভয়াও তদ্রূপ নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছিল। যে লোকটার আকস্মিক বিপদ শ্রবণে সে

অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই অসচ্চরিত্রতায় ঘৃণায় বিরক্তিতে, লোকটার সমস্ত স্মৃতি বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়েই সে রমেশ বাবুকে যতটা বলিয়াছিল, এবং না বলার যে অব্যক্ত রেশটুকু তাহার গলার মধ্যে জড়ানো ছিল, তাহাই এখন তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল।

মানুষ নিজেকে কি অসাধারণ ছদ্মবেশই না পরাইতে পারে! সে ত ছোট-বড় সকলের কাছেই নিখিলের মদ্যপ অপবাদ শুনিয়াছে, অথচ লোকটি যখন আসে যায়, কাহার সাধ্য সন্দেহ করে, এই সে! তাহার চিত্তের কি অসাধারণ দৃঢ়তা, আবার শিশুর মত কি সুকুমার সারল্য! মদ্যপ! সে কথা ত নিজের মুখেই সে একদিন স্বীকার করিয়াছিল, কৈ সে ত তাহা গোপন করে নাই! সে স্কুল থেকেই মদ খায়, রমেশ দা' বলিয়াছেন! অত অল্প বয়সেই! মদ ছাড়িবার যে কালের কথা রমেশদা' বলিয়াছেন, আশ্চর্য্য! সে কি তাহা পারিবে! এত দিনের অভ্যাস, কেহ কি একদিনে ছাড়িতে পারে! পাঁচ সাত বছর খাইয়াছে, যেমন বিবাহ করিল, আর অমনি ত্যাগ! এ'ও সম্ভব?

নবম পরিচ্ছেদ

মধ্যাহ্নে সৌদামিনী শয়নকক্ষে শুইয়াছিলেন, মহাভারতখানি পার্শ্বে খোলা রহিয়াছে। একটু আগেই পাঠ করিতেছিলেন, তন্দ্রাগত বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছেন, মৃদু অলঙ্কার শব্দে চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন—অভয়া!

অভয়া তাঁহার পায়ের কাছে মাথা নামাইতেই তিনি বিগলিত স্নেহে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

এত দিন আস নি মা, ভাবলুম, বুড়ী মা'কে মেয়ে বুঝি ভুলেই গেল। সেদিন নিখিল গেছল, এসে কত সুখ্যাতি কর্‌লে, বল্‌লে—মা অভয়ার মত মেয়ে হয় না। আমি বল্‌লুম বাছা, সে আর আমাকে বল্‌ছিস্ কি! যে থেকে ওর মা স্বর্গে যান, তখন থেকেই যে অভয়া আমাকে মা বলে জড়িয়ে ধরেছে।

অভয়া কথা কহিতে পারিল না, তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক উছলিয়া উঠিল।

সৌদামিনী কহিলেন,—আহা বাছা, নিখিল কাল নৌকো

ভেঙ্গে কি-যে বিপদ করে এসেছে, তা আর কি বল্‌ব। কপালটা এতখানি কেটে গেছে।

দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বেগ সম্বরণ করিয়া অভয়া জিজ্ঞাসিল—কেমন আছেন ?

সৌদামিনী অশ্রু মুছিতে মুছিতে কহিলেন—কি জানি মা, এখনও ত কোন খবর পেলুম না।

অভয়া বলিল—তিনি কি এখানে নেই ?

না মা, তার সব বন্ধুরা রাত্রের গাড়ীতেই তা'কে কল্‌কাতা নিয়ে গেছে। রোজ দু'বার করে তারে খবর দিতে বলেছি, তা কৈ! ভগবান এ বয়সে আরও আমার কপালে কি লিখেছেন, জানি না!

অভয়ার বক্ষ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। যাহার নামের শব্দটা পর্য্যন্ত কাল সে ঘৃণায় উপেক্ষা করিয়াছিল, আজ তাহারই সংবাদ লইতে এখানে আসিয়াছে, শুধু তাই নয়, তাহার অশুভ সংবাদে বুকের মধ্যে যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহা সে কোনমতেই সামলাইতে পারিতেছে না। মানুষের মনের একি বিচিত্র গতি!

সৌদামিনী বলিতে লাগিলেন—এক ছেলে যার, নদীকূলে বাস তার! তার উপর, ঐ সন্ন্যাসী ছেলে! সংসারের এমন জিনিষ দেখলুম না মা, যা আমার ছেলের কাজে লাগল।

সংসারে থেকেও যেন নেই। যার এত ধনদৌলত, লোকজন, সে জুতোটি ঝাড়তে পর্য্যন্ত কারুর সাহায্য নেয় না; কতদিন দেখেছি—ঘরে গরম হচ্ছে, নিজের হাতে বালিশ, মাদুর ঘাড়ে করে সে ছাদে গিয়ে শুয়েছে, তবু চাকর-বাকরকে ঘুম ভাঙিয়ে সে তোলেনি। কর্ত্তা এ সব পছন্দ করতেন না বলে সে বাড়ীই আসত না। আমি এখন বলি, তা সে হেসেই পাগল। হেসেই উড়িয়ে দেয়!

সেই হাসির সহিত অভয়ার পরিচয় হইয়া গিয়াছিল, অজ্ঞাতে সেই লোকটির সারল্যে, সততায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

সৌদামিনী বলিতে লাগিলেন—এক বছরই না হয় কাল-অশৌচ, তার পরেও যে ও সংসারী হবে, এমন কোন ভরসাই আমার নেই: আর আমিও যে জোর করে কিছু করব, সে সাহসও আমার নেই মা!

অভয়া নীরবে শুনিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, এই সময় কিছু বলে, কিন্তু পারিল না।

সৌদামিনী বলিলেন—তোকে আর নিখিলকে আমি আমার গর্ভের সন্তান বলেই মনে করি মা। আজ সে আমার কাছে নেই বলেই ভগবান তোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যে ক'দিন সে না আসে, যদি একবার করে আসতে বলি, আসবি কি মা?

'না' বলিবার ক্ষমতা অভয়ার ছিল না। বোধ করি সৌদামিনী এই সময়ে চাহিলে তাহার অদেয় কিছুই ছিল না।

সৌদামিনী সস্নেহে অভয়ার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন—অভয়া, কি বল্‌ব তোকে—একটা দিন আমি ভাবতে পারলুম না যে অভয়া আমার পর। কত বাসনাই যে এই পোড়া বুকের মধ্যে জন্মায়, আর চোখের জলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, তা আর কি বল্‌ব! বিধাতা বিমুখ, নৈলে তোকে কি আর চোখের আড়াল করি!—বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অভয়া মুখ ফিরাইয়া লইল! তাহারও অশ্রু রোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, আস্তে আস্তে বলিল—মা, আমি ত এখানে থাক্‌ব না, বৈশাখ মাসেই কলিকাতায় যাচ্ছি।

সৌদামিনী বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন—কেন মা, কল্‌কাতায় কেন?

মাসীমার বাড়ী—বলিয়া অভয়া মুখ নীচু করিল।

তাহার এই লজ্জাটুক্ এই সংসার অভিজ্ঞা প্রবীনার নিকট তাহাকে সহজেই ধরাইয়া দিল। সৌদামিনী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—জোর করবার যে আমার কোন সম্বলই নেই মা, না বল্‌ব কেমন করে।—বলিয়া তিনি বার বার চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

অভয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভাবিল, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে—মা সে জোর পৃথিবীতে তোমার চেয়ে কারু বেশী নেই।

সরকার মহাশয় ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন্—এই মা খবর এসেছে

তার খানি লইয়া সৌদামিনী অভয়ার হাতে দিয়া বলিলেন—পড় ত মা! মিছে করে বলিস্ নে—ঠিক কি লিখ্ছে বল্।

অভয়া বলিল—উন্নতি কর্‌ছেন।

তারে লেখা ছিল—Nikhil improving, Satinath,

"কে করেছে?"

সতীনাথ।

সরকার মহাশয় বলিলেন—বাবুর সেই ডাক্তার বন্ধুটি।

সৌদামিনী বলিলেন, একখানা তারের কাগজ এনে দাও ত, বিষ্ণু।

তারের কাগজ আসিলে সৌদামিনী অভয়াকে কহিলেন—লেখ ত মা, সতীনাথকে, কতদিন ওখানে লাগবে, কবে আস্‌বে?

তারটি লিখিয়া অভয়া শেষের ছত্রটি বার বার কাটিতে লাগিল। সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মা ভুল হয়েছিল?



অভয়া সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—লিখেছি মা, পাঠিয়ে দিন।

তারখানি হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া বিষ্ণুকে সৌদামিনী বলিলেন—এখনি পাঠিয়ে দাও, বিষ্ণু!

উনিই কি মা বাজীৎপুরের—

হ্যাঁ। দেখত বিষ্ণু, ও কাটাটায় কি লেখা ছিল?

বিষ্ণু বলিল—'অভয়া" কেটে, 'মাদার—মা' করা হ'য়েছে।

সৌদামিনী ঘরে ঢুকিয়া অভয়াকে চুম্বন করিয়া কহিলেন—চ' মা, একটু জল খাবি?

জল খাওয়া কেন মা?

সৌদামিনী বলিলেন—কাছে পেয়েছি, একটু আদর-যত্ন করতে দে' মা। দুনিয়ায় আমার যে আর কেউ নেই অভয়া—তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া অভয়া বলিল—চল মা, খাই-গে।

একরকম বুকে করিয়াই সৌদামিনী অভয়াকে নীচে লইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

কয়দিন হইতেই অভয়া নিজেকে একরকম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, অন্যমূর্ত্তিতে নিখিলের সম্মুখীন হইবে! কিন্তু দিনের পর দিন যখন কাটিয়া গেল, নিখিল আসিল না, অথবা কোন সংবাদই পাঠাইল না, তখন তাহার অভিমান অশ্রুতে পরিণত হইয়া গেল। সেই উদাসীন লোকটি যে সংসারে সৌজন্যের খাতিরে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক পা চলিবে না, ইহা অভয়া বিশেষ করিয়াই জানিত। একদিন সে অভয়ার কাছে দরবার করিতে আসিয়াছিল, প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া গেছে!—আর সে কেন আসিবে? কিন্তু তাহার আসাটা যে কতখানি আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা অভয়ার উদ্বেগাকুল মুখের দিকে চাহিলেই বুঝা যায়। তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছে, অত বড় একটা নামজাদা লোককে দুইটি নগণ্য প্রজার দ্বারা অপমানিত করিয়াছে, তাহার আসিবার আর মুখ রহিল কোথায়? অথচ প্রত্যহ সকালেই যেন তাহার মনে হইত, এখনি পর্দ্দা ঠেলিয়া সেই বৃহদাকার লোকটি ঘরে ঢুকিয়াই হাসিয়া ফেলিবে!

প্রথম প্রথম অভয়া ভাবিত, হয়ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই বা শরীরে যথেষ্ট বল পান নাই। সারিলেই একবার দেখা করিতে আসিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আমি যে তাঁহাদের গৃহে গিয়াছিলাম, সৌদামিনীর নিকট এ কথা শুনিতে তাঁহার বাকী থাকিবে না। তখন একবার আসিবেন-ই।

মানুষের প্রকৃতি এই, দৌর্ব্বল্যের স্থানটুকুই সে পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়া থাকে। অভয়াও যে একদিন সেই লোকটাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিল, তাহাই তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল।

পাইক ডাকিয়া কালীচরণ ও ছাব্বানী সেখকে খুঁজিয়া আনিতে বলিয়া দিল। তাহারা আসিলে নিজেই রুক্ষস্বরে বলিয়া দিল—তাহারা যে অন্যায় করিয়াছে, তাহার জন্য সোণাগাঁর জমিদারের নিকট গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা না করিয়া আসিলে, তাহাদিগকে এই গ্রামে বাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।

লোক দুইটা ম্যানেজার রমেশ বাবুর আদেশের কথা বলিতে যাইতেছিল, ধমক্ দিয়া অভয়া বলিল—সে সব আমি শুন্‌তে চাই না। সোনাগাঁর বাবুর কাছে যাও, তিনি যদি ক্ষমা করেন—

'তার কোন দরকার নেই'—বলিয়া সোনাগাঁর বাবু ঘরে ঢুকিলেন। অভয়া শক্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল।

নিখিল তাহাদের বাহিরে যাইতে বলিয়া বসিল। অভয়ার পানে চাহিয়া স্মিতমুখে কহিল—তুমি যে ঠিক সেই রকম করলে, অভয়া, কুকুর মারলে, অথচ হাঁড়ি ফেল্‌লে না।—বলিয়া সে হাসিল।

অভয়া কোন উত্তর দিতে পারিল না।

নিখিল বলিল—'ওদের শাসন না করে' ওদের জমিদারকে শাসন করা উচিত ছিল তোমার! এ কথা ত কেউ বিশ্বাস করবে না যে, ওরা জমিদারের বিনা হুকুমে আমার আবাদ ফেলে চলে আস্‌তে সাহস করেছে।

অভয়ার সংযম ভঙ্গ হইল, সে কঠিনস্বরে কহিল—কি করতে বলেন, তা' হ'লে ?

হয় ওদের জমিদারকে শাসন কর, নয় ত যেতেই দাও; যা হয়েছে, তার ত আর চারা নেই,—বলে একটু মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিস—এবার সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

তাহার হাসি থামিলে অভয়া বলিল—আমিই ভুল করছিলুম, ওটা আমার উপেক্ষা করাই উচিত ছিল।

নিখিল অটল। সে হাসি মুখেই বলিল—আমিও তাই আশা করি।

অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া নিখিল বলিল—আমার মার কাছে গিয়ে তুমি যে তাঁকে যথেষ্ট সুখী করেছিলে, অভয়া, তার জন্য আমি তোমার কাছে যে কতদূর কৃতজ্ঞ, তা কি বলব! কল্‌কাতাতে বিছানায় পড়ে পড়েই কথাটা কেমন আমার মনের মধ্যেই জেগে উঠ্‌ল। এসে শুন্‌লুম, সত্যিই। এ যে তোমার মহৎ অন্তঃকরণেরই পরিচয়, তা মাও জানেন, আমিও জানি। তাই মা আমার এখানে আসার পর থেকেই বল্‌ছেন—যা, যা, একবার অভয়াদের বাড়ী যা। তুই সেরে এসেছিস্ দেখলে সে বড়ই,—খুব সুখী হবে।

অভয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িল। এমন করিয়া আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে তাহার যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। অথচ ইহার মূলে যে সেই মহিমাময়ী রমণীর মাতৃহৃদয়ের স্নেহ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, সে তাহা জানিত। আপনাকে দমন করিয়া অভয়া নিখিলের পানে চাহিয়া কহিল—সত্যি আমি সুখী হয়েছি।

সে বিরোধের ভাবটা কখন্ কাটিয়া গেছে, এবং সেই জায়গায় এই লোকটির সুস্থতার আরামে কখন্ ভরিয়া গেছে—সে জানিতেই পারে নাই।

নিখিল বলিল—তোমারই গ্রামের ঘাটে আমাদের নৌকা ভেঙ্গেছিল। প্রথম মুহূর্ত্তে আমার মনে হ'ল, এখানেই উঠে

আসি, সেবা যথেষ্টই পেতুম, কিন্তু তখন ত আমার জ্ঞান ছিল না, আমাকে পাল্কী করে তুলে নিয়ে গেছল!

অভয়া অব্যক্ত কণ্ঠে কহিল—অজ্ঞান ছিলেন?

নিখিল কহিল—এই দেখ মা মাথাটা! কতটা কেটেছিল!

কি রকমে নৌকো ভাঙল?

তুমি বুঝি শুনেছ—

না, না, আমি কিছু শুনি নি, শুধু জিজ্ঞাসা করছি।

না শোনাটাই ভারি আশ্চর্য্য কি-না! সবাই ত বল্‌ছে, বাবুটি মাতাল হয়ে হাল ধরেছিল—

আপনি তার প্রতিবাদ করলেন না!

হাঃ হাঃ—এ একরকম মন্দ কথা নয়! তা'হলে এই দশবিশখানা গ্রামের বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রতিবাদ করে আস্‌তে হয়। তা'হলে হয়ত তোমার বাড়ীটাও বাদ যায় না।—বলিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিল।

যাক্ সে কথা। তুমি এ সব কি করেছ অভয়া? আমার সঙ্গে বিরোধ করেছিলে, তাতে বিশেষ ক্ষতি ছিল না! কিন্তু প্রজা বিরোধ করছ কেন? কাল তোমার সমস্ত প্রজা আমার কাছারীতে গিয়ে ধন্না দিয়েছিল। তুমি নাকি তোমার 'ক্ষীরপুকুরের' জল মাঠে নিতে দিচ্ছ না? হাঁ একটা কথা অবশ্য গোড়াতেই বলা উচিত। যদি বল এ প্রশ্ন করবার তোমার কি অধিকার আছে?

আমি বলছি—নেই-ই। তবে প্রজারা আমাকে এসে ধরেছে,—আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে' ত কিছু করতে পারি না!

অভয়া কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া নিখিলনাথ কহিল—এখনি আমি 'ক্ষীরপুকুর' দেখে আসছি; তোমার জননীর স্মৃতি-ফলকখানি পড়ে ক' ফোঁটা চোখের জল রাখতে পারি নি; তুমি বলবে ফলকেই ত লেখা আছে—'স্বাস্থ্যকর পানীয়ের অভাব দূর করিতে···মহিয়সী···র পুণ্যময় নামে উৎসর্গীকৃত হইল,' কিন্তু এও ত দেখতে হবে, চাষীর ফসল না হলে তোমার পুকুরের ক্ষীর খেয়ে কিছু সত্যিই তারা বেঁচে থাকবে না!

তারপর!

তারপর! তুমি বুঝি ভাবছ, লোকটা কি বিষম অনধিকার চর্চ্চাই না করছে! কিন্তু কথা ত তা নয়! এ ত তোমায় আমায় কথা নয়—এ যে সমস্ত প্রজার সঙ্গে, সমস্ত জাতির সঙ্গে, সারা দেশটার সঙ্গে যোগ রয়েছে। তোমার সঙ্গে কথনো আলাপ পরিচয় না থাকলেও এমন করে' আমাকে আসতেই হ'ত।

অভয়া বলিল—জানেন ত গ্রামের মধ্যে ঐ একটি পুকুর, যার জল লোকে খেতে পারে। এখন থেকে যদি তার জলটা লোকে সেঁচেই তুলে দেয়, সেই জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় পর্য্যন্ত খাবে কি! তখন যে জল অভাবে মারা পড়বে। এর ত কোন উপায়ই আমি

দেখছি না। করবারও কিছুই নেই। আপনি উপায় বলে দিন, আমি রাজী আছি।

নিখিল কহিল—বরঞ্চ আমি বলি কি, পুকুরটা মাঠের কাছে, চাষের জল ঐ থেকেই নিতে দাও খাবার জলের অভাবটা আমার খাল থেকে মিটতে পারবে। সে'টা যদি তোমার প্রজাদের মাঠের কাছে হ'ত, সেঁচতে দিতে আমার কোন আপত্য ছিল না, কিন্তু অত দূর থেকে, নালা কেটে মাঠে জল নিয়ে যেতে প্রজাদের দুঃখের সীমা থাকবে না। খাবার জল লোকের খুব বেশী দরকার হয় না, আমার ওখান থেকেই আনতে পারবে।

অভয়া দৃপ্তস্বরে কহিল—কিন্তু তা'তে লোকে এ কথাটা ভুলবে না যে বাজীৎপুরের প্রজা সোণাগাঁর খালের জল খেয়ে বেঁচে আছে। সে'টা আমার পক্ষে গৌরবের কথা হবে না।

ওঃ—বলিয়া নিখিল অন্যমনস্কভাবে বাহিরে চাহিল।

কণ্ঠস্বরকে যথাসাধ্য আয়ত্ত করিয়া অভয়া বলিল—তার চেয়ে বরং অন্য কোন উপায় দয়া করে' আমাকে বলে দিন।

নিখিল একটুখানি তেজের সহিতই বলিল—কিন্তু এটাও তোমার পক্ষে গৌরবের কথা হবে না অভয়া, যে লোকে বলবে বাজীৎপুরের জমিদার সোণাগাঁর জমীদারের পরামর্শ নিয়ে তবে কাজ করেছে।

এই আঘাতটুকু অভয়ার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, সে

তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—ধন্যবাদ, আপনি আমাকে যথেষ্ট সাবধান করে' দিয়েছেন। সে আসন ছাড়িয়া উঠিতেই নিখিল হাসিয়া বলিল—যাই কর, অভয়া, একটি কথা শুধু মনে রেখ, তুমি মা, আজ হও, কাল হও, তুমি মা! সন্তানের দুঃখ কষ্ট দেখতে ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করেন নি, আর তোমার অভয়া নামের অসার্থকতা কখনই কর না।—বলিয়া সে হাসিমুখেই চলিয়া গেল।

ঘরখানির মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অভয়ার পক্ষে অসাধ্য হইতেছিল। তাড়াতাড়ি শয্যায় গিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। উপাধান ভিজিয়া গেল, থাকিয়া থাকিয়া বুকখানা যেন আলোড়িত হইতেছিল, কি গম্ভীর কণ্ঠেই সে বলিয়া গেল—তোমার অভয়া নামের অসার্থকতা কখনই কর না।

অনেক বেলায় দাসীর ডাকাডাকিতে সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতেই, কক্ষপ্রাচীর বিলম্বিত দীর্ঘ মুকুরে নিজের চেহারাখানা দেখিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে, ক্রোধে ঘৃণায় অভিভূত হইয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ইদানীং প্রজারা তাহার কাছে কোন কথাই বলিতে সাহস পাইত না, তাহারা জানিত, রমেশবাবু যাহা করিবেন, তাহাই হইবে এবং তাহাই হইত। অভয়া সকল দিক্ না বিবেচনা করিয়াই নিখিলকে উত্তর দিয়াছিল। উত্তর দিবার সময়ে নিজেকে দমন করিতে পারে নাই। তাহার এই ক্রোধোন্মত্ততাতেও কিন্তু সেই লোকটির হাসির রেখা মুখ হইতে লুপ্ত হয় নাই। মত্ততা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেলে, নিজের রূঢ়তা এবং ধৈর্য্য হীনতা স্মরণ করিয়া লজ্জায় সে মরিয়া যাইতেছিল।

রমেশবাবু তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, ক্ষীরপুকুরের জল না পাইলেও প্রজারা যেমন করিয়াই হোক্, আবাদ করিবেই। ক্ষীরপুকুরের পবিত্রতা ও তাহার উদ্দেশ্য বজায় রাখিতে হইলে, আমাদের কঠিন হইতেই হইবে।

ক্ষীরপুকুরটি যে তাঁহার স্বর্গগত মেসো মহাশয় 'ব্রাহ্মমতেই' খনন করিয়াছেন, আর কেহ না জানিলেও, তিনি তাহা ভালো করিয়াই জানেন। পুকুর কাটানোর মধ্যে 'ব্রাহ্মমত বা অ-ব্রাহ্মমত' কি তাহা অভয়াও জানিত না, আমরাও জানি না। কিন্তু রমেশবাবুর মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহা অজ্ঞাত ছিল না।

অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষের শীর্ণমূর্ত্তি কল্পনা করিতেই অভয়ার নারী-হৃদয় বেদনায় নত হইয়া পড়িল। তাহার এই দুই তিন সহস্র প্রজার মিলিত হাহাকারের ধ্বনিটা মনে পড়িতেই সে বিহ্বল হইয়া পড়িল। যাহার সহিত বিরোধ করিয়া কিছু পূর্ব্বেই কথাটা সে চাপা দিয়াছিল, সে ত এই আর্ত্তনাদ কল্পনা করিয়াই সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছে।

এখন আর কোন উপায়ই নাই। হয় ত নিখিলের পরামর্শটাই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু এখন আর তাহা ভাবিয়া লাভ কি? আর সে প্রস্তাব করিবার পথ নাই। সে ত নিজের হাতেই সে পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

রমেশবাবু কিন্তু পরম নিশ্চিন্ত। অভয়া কোনমতেই তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। উপরন্তু সেই মাতালটা আসিয়া যে অভয়াকে ভয় দেখাইয়া গিয়াছে, ইহা জানিবামাত্র তিনি অভয়াকে বেশ কয়টা কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। এবং সেই ভয়ে যে অভয়া বিচলিত হইয়াছে, ইহা ভাবিতেও তিনি যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন, বারবার করিয়া সে কথাটাও তিনি অভয়াকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু নদীর এক দিকের বাঁধ ভাঙিলেই চারিদিকের জল যেমন সেই পথেই ছুটিয়া চলিতে চায়, অভয়ার মনও সেই অভয়া নামের ব্যতিক্রমের ভয়েই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল।

কি সঙ্কল্প লইয়াই না সে নামিয়াছিল। প্রজার দুঃখ কষ্ট

দূর করিয়া সুখশান্তি স্থাপন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াই সে কার্য্যের ভার আপনার হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। আজ কোথায় তাহার সে প্রতিজ্ঞা, কোথায় রহিল সে সঙ্কল্প ?

অনুনয়, বিনয়, কাতরতা যখন কোন কাজেই আসিল না, তখন প্রজারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। একদিন সকালে উঠিয়াই অভয়া শুনিল, 'ক্ষীরপুকুরের' দুই জন শিখ-রক্ষী আহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রজারা 'ডোঙা' টাঙাইয়া জল তুলিতেছে। এই সংবাদে আশাতীত আনন্দে অভয়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কিন্তু, অপমানের বোঝা তাহার উন্নত মস্তকে তখনই বজ্রাঘাত করিয়া দিল।

ইহার তলে যে কোন শক্তিশালী লোকের পরামর্শ আছে, রমেশবাবু এই কয়টা কথা বলিতে বলিতে অভয়ার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন।

অভয়া প্রতিবাদ করিল না। যদিও সে জানিত, নিখিল কখনই তাহার অপমান করাইবে না—তথাপি প্রতিবাদ করিবার মত মনের জোর তাহার ছিল না।

তুমি বল অভয়া, যেই হউক্ না কেন সে পরামর্শদাতা, সব ঠাণ্ডা করে' দিই। প্রজাদের এত স্পর্দ্ধা—

সত্যিই ত !

শুধু একবার তুমি বল—

অভয়া দৃপ্তস্বরে কহিল—আমার অমত নেই।

রমেশ বাবু বিজয়-গর্ব্বে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কলিকাতায় তাঁহার এক উকীল বন্ধু ছিলেন, তাঁহাকে আসিতে জরুরী তার করিয়া দিয়া, কাছারীতে আসিয়া আবশ্যকীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করাইতে বসিয়া গেলেন।

রামহরি অভয়াকে কহিল—মা, রাস্তা চলা যে ভার হয়ে পড়ল। লোকে বলাবলি করছে, জমিদারের লোক দেখলেই মারবে। আর রমেশবাবুকে পেলে ত কথাই নেই।

অভয়া শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞাসিল—হাঁরে, যদি হঠাৎ তাঁরা আমায় দেখ্‌তে পায়?

রামহরি জিব কাটিয়া বলিল—তা'ও শুনেছি। তোমায় তারা কিছু বলবে না মা। তা'দের রাগ ঐ রমেশবাবুর ওপর। তারা বলে, তাঁর মাথাটা ত ফাটিয়ে দেবেই, তার পর তোমরা আদালত কর সোণাগাঁর জমিদার নাকি তা'দের বলেছেন, জেলে গেলেও তাদের ছেলেপুলেদের খোরাক-পোষাক সব যোগাবেন।

রামহরি দেখিতে পাইল না, যে অভয়ার মুখ হইতে উত্তেজনার রেখাগুলি মিলাইয়া মুখখানি সাদা হইয়া গেল। অভয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিল—এ কথা তো'কে কে বল্‌লে?

সকলেই বল্‌ছে মা। আরো বল্‌ছে, আদালত শেষ হলে

জমিদার না হয় গ্রামের বাসই উঠিয়ে দেবে, তা' তারা সোণাগাঁর তালুকে বাস করবে।

অভয়া ভাবিল, দর্পিতার এই ত উচিত শাস্তি! তাহাকে অক্ষম বুঝিয়াই তিনি এই ভার তুলিয়া লইয়াছেন। তাঁহার ত কোন দোষই নাই। তিনি ত প্রতীকারের আশায় তাহার কাছেই আসিয়াছিলেন। হায় রে অবোধ নারীচিত্ত! নিজেকে লাঞ্ছিত বুঝিয়াও পীড়কের প্রতি একটুও ক্রোধ জন্মিল না। অবাধে, নীরবে এই অপমানটুকু সহিতেই প্রস্তুত হইয়া পড়িল।

রামহরিকে পাল্কী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া অভয়া তাহার শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। দেওয়ালে পিতার তৈল-চিত্র লম্বিত ছিল, তাহারই সম্মুখে আসিয়া সজলকণ্ঠে কহিল—বাবা এ যে বড় বিপদ। কোনমতেই আমি সামলাতে পারছি না। বলে দাও, পিতা, আমার কর্ত্তব্য কি? চারিদিকে তোমার কন্যার দুর্নাম রটেছে, তার অভয়া নামেরও ব্যতিক্রম ঘটেছে। কোথায় আছ জনক আমার, আমায় রক্ষা কর—রক্ষা কর।

অভয়ার মনে হইল, তাহার পিতার স্মিতহাস্যে প্রোজ্জ্বল মুখখানি তাহাকে অভয় দিতেছে। চিত্রের নিম্নে একটি ক্ষুদ্র লোহার সিন্দুক গ্রথিত ছিল। কোন দিন কোন দরকারেই অভয়া সে সিন্দুক খুলে নাই। তাহার পিতা বলিয়াছিলেন,

বিশেষ দরকার ভিন্ন খুলিও না। আজ চাবি খুলিয়া অভয়া তারই সামনে মূঢ়ের মত বসিয়া পড়িল। আজি তাহার মনে হইল, এই তাহার দরকারের সময়! আর হয় ত এমন দিন আসিবে না।

একটি হাতীর দাঁতের বাক্সে কয়েকখানি পত্র রাখা ছিল। একখানা খুলিয়াই অভয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। উহা তাহার মাতার লিখিত। পিতা বাহিরে কোথায় ভ্রমণে গিয়াছেন, সেখানেই লিখিত।

"এ তোমার কি অন্যায় তর্ক, আমি বুঝি না। তোমার মত ধনবান, বিদ্বান লোকও যদি পাঁচ জনের কথার ভয়ে সৎকার্য্য করতে বিরত হবে, তাহলে সাধারণের ত কথাই নেই। তুমি কি মনে কর, অভয়া নিজেই আমার বোনেদের বাড়ীর রীতি-নীতি পছন্দ করে না? আমি যে নিজে দেখে এসেছি, সকলের চেয়ে অভয়া বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সকলের সঙ্গে মিশতে সে সব সময়েই প্রস্তুত। এ সব দেখে শুনেও, আমার কথা গ্রাহ্য না করে' যদি তুমি তা'কে এই পাড়াগাঁয়ের রানা শামীর মত একটা বিয়ে দাও, আমার দুঃখ করবার কোন কারণ নেই, তবে তোমার মেয়ে কোনমতেই তোমায় ক্ষমা করতে পারবে না। আমার কি বল, মেয়ে সুখী হলেই আমি সুখী। তুমি যদি পিতা হয়ে একটা গাড়ল এনে ঘরজামাই কর তা'তেও আমার বল্‌বার কিছুই নেই, কিন্তু মেয়ে কি তা সহ্য

করতে পারবে? কখনই না। আমি যা বলছি, মেয়ের মুখ চেয়েই।”……এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই অভয়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাহার সম্বন্ধে তাহার পিতার কি ইচ্ছা ছিল, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেই সে আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। পত্র প্রভৃতির সঙ্গে আর একটা প্যাকেট দেখিয়া, অভয়া সে'টি তুলিতেই দেখিল, লেখা আছে—আমার অভয়ার পরিণয়ে যৌতুক।

ঘরে কেহ ছিল না, এবং এই সমস্ত ক্ষুদ্র কারণে লজ্জিত না হইবার মতই তাহার শিক্ষা-দীক্ষা ছিল, তথাপি আরক্ত মুখে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া তাহার নির্জ্জনতা উপলব্ধি করিয়া অভয়া সুস্থ হইল। অদম্য কৌতূহলে তাহার বক্ষ দুলিতে লাগিল।

প্যাকেটটি খুলিবামাত্র একখানি পত্র ও একটি হীরার কণ্ঠী বাহির হইয়া পড়িল।

পত্রে কয়টি ছত্র লিখিত ছিল—মা অভয়া! তুমি যাতে সব সময়েই সমস্ত মীমাংসা নিজে করতে পার, তার জন্যই আমি তোমাকে সুশিক্ষিত করেছি। সেই শিক্ষার সঙ্গে, তোমার পিতার এই কথাটি স্মরণ রেখো মা, কোন কাজেই ভগবানের রূপ-বিচার বা তাঁর দয়া-অদয়ার কথা ভেবে নিজেকে কি আর কাউকে পীড়িত করো না। যখন তাঁকে ভাববে, তখন তাঁকেই কেবল মাত্র ভে'বো। তিনি সুন্দর কি কুৎসিৎ, তাঁর রূপ আছে কি নেই—এ সব কথা ভেবো না। তুমি ত তাঁকেই ডাকছ, তাঁর


গণেশ
১১২

আরাধনা করছ—তখন অন্য তর্ক তুলে তোমার লাভ কি! সে তর্ক কোনদিনই করো না—আর তাঁকে আরাধনা করবার জন্যে কি নামে ডাকবে, মন্দিরে বসে কি গাছের তলায় বসে ডাকবে—তাও ভেবো না। তাঁকে বুকের মধ্যে অনুভব করবে, আর যেরূপে, যে দৃশ্যেই দেখ-না কেন—ভক্তি দিতে কুণ্ঠিত হ'বে না। মা-অভয়া, তোমাকে সর্ব্ববিষয়ে যেমন স্বাধীনতা দিতে আমি কার্পণ্য করি নি—এই চরম স্বাধীনতা দিয়েও আমি তেমনি সুখ অনুভব করছি।

হীরার কণ্ঠিটির কথা সে অনেকবার শুনিয়াছিল। তাহার পিতা তাহার কিশোরী জননীর গলে কণ্ঠিটি দোলাইয়া দিয়াছিলেন। দেব-মন্দিরের দেবতার প্রসাদী পুষ্পমাল্যের মতই অভয়া হীরার কণ্ঠিটি নিজের গলায় দোলাইয়া পিতার চিত্রের নিম্নে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, এবং ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া ডাকিল—রামহরি!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রমেশবাবু আসিয়া বিস্মিতের মত বলিলেন—অভয়া, তুমি বেরুচ্ছ নাকি?

অভয়া স্বল্প হাসিয়া কহিল, হাঁ, আমার কোন ভয় নেই। তারা আমায় কিছু বল্‌বে না।

রমেশবাবু মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—বল্‌বে আবার কা'কে! বেটাদের মাথায় শুপারী রেখে খড়ম দিয়ে ভাঙ্‌ব না?

অভয়া হাসিল, বলিল—আমাকে কিছু দরকার আছে কি?

রমেশবাবু কহিলেন—একটু ছিল বৈ কি।

অভয়া বলিল—তবে চট্‌ করে বলে ফেল। আমার পাল্কী তৈরী।

রমেশবাবু বলিলেন—তুমি ত আস্‌ছে মাসেই কলকাতা যাবে বল্‌ছ, আমি বলি কি, এই হাঙ্গামের সময় এখানে তোমার থাকাটা যুক্তিযুক্ত নয়, তুমি শীঘ্রই একদিন রওনা হয়ে পড়।

অভয়া বলিল—পাগল! এই চৈত্র মাসে! তা কি হয়?

রমেশ বলিলেন—কেন হবে না? তুমিও ঐ চৈত্র-ফৈত্র মান্‌বে না কি?

অভয়া শান্ত-সংযতকণ্ঠে কহিল—মানবো কি বল্‌ছ, রমেশ দা' আমি চিরদিনই মানি। আমি ত অহিন্দু নই!

রমেশ বাবু ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন—হা অদৃষ্ট!

আর কিছু বল্‌বার আছে?

তুমি যাবে কোথায় শুনি?

আমি সোণাগাঁয় যাচ্ছি।

কথাটা বলিতে যে অভয়ার গলা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, রমেশ বাবুর মত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি লোকের চক্ষুতে তাহা এড়ায় নাই। তিনি বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন—সেখানে কেন? সেই হতভাগা পাজীটাই ত এই সব হাঙ্গামা বাধিয়েছে।

সেই জন্যেই ত যাচ্ছি—বলিয়া অভয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

ছেলেবেলাকার পড়া, Try, try try, again and then you will succeed—অনেক লোকের জীবনাবধি ঐ ছত্রটা মনে থাকে।

রমেশ বাবু অনন্যোপায় দেখিয়া বলিলেন—তা' হলে আমি মা'কে লিখে দিই, তুমি কোন দিনই কল্‌কাতায় তাঁর কাছে যাচ্ছ না? এ শুধু তাঁকে মিথ্যা প্রতারণা করা?

অভয়ার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, সে কঠিনস্বরে কহিল—মিথ্যা প্রতারণা! যাক্—যা লেখবার তুমি লিখ, তা' জানবার আমার কোন দরকার নেই।

তা' জানবার দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু সোণাগাঁয় তোমার যাওয়া হতে পারে না।

রমেশ দা', একটু বিবেচনা করে চলো। তুমি ঠিক আমার অভিভাবক নও।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

প্রথমতঃ সোণাগাঁয় যাইবার জন্যই সে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু পথে বাহির হইয়াই তাহার মন বাঁকিয়া বসিল। 'ক্ষীরপুকুরে' পাল্কী লইয়া যাইতে বলিয়া সে দুই হাতে পাল্কীর দ্বার খুলিয়া দিল। কোন দিনই সে দ্বার মুক্ত করিয়া গমনাগমন করে নাই, কিন্তু আজ তাহার চিত্তের মধ্যে যে ক্ষোভ উঠিয়াছে, তাহাদেরই মুক্তি দিতে সে নির্ভীকের মত যাইতে ও আসিতে চায়!

চারিধারে লাঠি লইয়া প্রজারা পুকুর পাহারা দিতেছিল। ডোঙায় গরু লাগাইয়া জল তুলিতেছে। একখানা পাল্কী সেই পথে আসিতে দেখিয়া, কয়জন লোক সম্মুখের বাহকদ্বয়ের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ পাল্কী থামিতে দেখিয়া অভয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য মুখ বাহির করিতেই যাহারা পাল্কী আটক করিয়াছিল, তাহারা সরিয়া গেল। পাল্কী নামাইয়া অভয়া ধীরে ধীরে সোপানে আসিয়া বসিল। বোধ করি, দু'তিন মিনিটের জন্য জল তোলা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আবার চলিতে লাগিল। প্রজারা তাহাকে চিনিয়াছে, অথচ কোন

অভ্যর্থনাই করিল না, ইহাতে অভয়া নিজের প্রতিই বিরক্ত হইল।

প্রতি গ্রামেই দু' এক জন মাতব্বর লোক থাকে। অন্য সমস্ত লোক এই হেড্-ম্যানের পরামর্শে চলিয়া থাকে। অভয়ার আগমন সংবাদ পাইবামাত্র দুইজন মাতব্বর আসিয়া বিনীতভাবে প্রণত হইল।

মহেশ মোড়লের বয়স ন্যূনাধিক নব্বই বৎসর। সে একটু হাসিয়া বলিল—মা-যে নিজেই আমাদের দর্শন দেবেন, তা' আমরা কখনই ভাবি নি। তোমার সন্তান, মা, পাঁচটা পাঁচ রকমের হলেই বা, তুমি, তা'দের দুঃখ দেবে কি করে? বল ত মা, আমাদের দুঃখে তোমার বুকে বাজে কি-না?

অভয়াকে নিরুত্তর দেখিয়া মহেশ মোড়ল আর একটু স্পষ্ট গলায় বলিতে লাগিল—আমরা গোড়া থেকেই জানি, মা যে এ-সব দুঃখ তুমি আমাদের দিচ্ছ না। কু-পুত্র হলেও জননী ত কু হয় না, মা। তুমি বিশ্বাস করছ না মা, যে বুড়োটা এ সব কি বলছে! তুমি একবার মুখ ফুটে বল যে আমার পুকুরের জল তোমরা নিও না, তোমাদের চাষ না হয়, না হোক; তোমরা বাঁচ মর—আমার কি; দেখ্বে, আমরা সকলে চলে যাব। কেউ যদি যেতে দেরী করে, আমায় তার দণ্ড দিও। তোমার কাছে আমার শির জামিন।—বলিয়া সে মাথাটা পাতিয়া দিল।

অভয়া আর্দ্রস্বরে কহিল—প্রথমেই তোমরা তোমাদের দুঃখ আমাকে না জানিয়ে অন্যের কাছে গেলে কেন?

বৃদ্ধ মোড়ল বলিল—বুঝেছি মা, এই জন্যই তুমি বিরূপ হয়েছ। আমরা সোণাগাঁর জমিদারের কাছে গেছি কেন? অবশ্য সে অপরাধ স্বীকার কর্‌ছি। কিন্তু তুমিই বলত, পাশের গাঁয়ে ও রকম কাণ্ড দেখে, কার না যেতে লোভ হয়?

উত্তরের আশা করিয়া মহেশ এক মুহূর্ত্তকাল থামিয়া বলিল—মা, যার গরু নেই, জমিদার তার গরু কিনে দিচ্ছে; হাল নেই, হাল তৈরী করে দিচ্ছে, পাট পচাবার পুকুর নেই, পুকুর কেটে দিচ্ছে? হাঁ মা, বল দেখি, এ সব দেখে তাঁর আশ্রয়ে গিয়ে পড়া কি বড্ড বেশী অপরাধ?

অভয়া ইহার কি উত্তর দিবে? নিরাশার অন্ধকার হইতে উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি দেখিয়া কে না তাহার সন্ধানে ফিরে?

মহেশ মোড়ল বলিল—সেই-ই যদি আমাদের অপরাধ হয়, দণ্ড দাও, মাথা পেতে নিচ্ছি। যা দণ্ড দেবে, আমরা হাসি মুখে তোমার দয়া বলে মেনে নেব।

অভয়া স্নেহসিক্তস্বরে কহিল—না, না এতে তোমাদের অপরাধ কিছু নেই। তিনি দরিদ্রের, অসহায়ের সাহায্য করে থাকেন,—

মহেশ মোড়ল মুখের কথা কাড়িয়া লইয়াই বলিল—সাহায্য বলে সাহায্য। মা, আমার এই চারকুড়ি পাঁচকুড়ি বছর বয়সের

মধ্যে অমন আর দেখি নি। প্রথম যখন সোণাগাঁর বাবু মল, লোকে ত ভেবেই সারা। তারা জান্‌ত, 'কলকাতায় এই বাবু কেবল মদ খায়, আর মদ খায়। তার পর যখন তিনি এল মা, এক মাস ত অষুধ বিষুদই গেল, কেউ আর জমিদারের দেখা পায় না। সকলেই ভাবে, কি-হয়, কি-হয়। শ্রাদ্ধ-শান্তির পর জমিদারের দেখা পেলে। সে মা ঐ সোণাগাঁর হাটে। একটা মেয়ে—বাপের অসুখ, বদ্দি দেখাবে, ক'টা পেঁপে বেচতে এসেছিল, জমিদারের পাক্‌ পেঁপে তোলা নিয়েছে বলে' কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী যাচ্ছিল, তার হাতে একটা টাকা দিয়ে জমিদার বলে গেল, আর তোদের তোলা দিতে হবে না। হাটে তোলা নিতে জমিদারের লোক প্রজার উপর যে অত্যাচার করত, কি আব বল্‌ব। এক কথায় উঠে গেল। অমন লোক যদি মাতাল হয়, তবে ভালো কে হবে মা?

অভয়ার চিত্ত সমস্ত আবছায়ার ভিতর হইতে মুক্ত হইয়া পড়িল। সে-ও ত ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিল—অমন লোক দুশ্চরিত্র হইতে পারে না! এই সত্যান্বেষণে সে কত-না ব্যথা নিজের মনেই পাইয়াছে!

অভয়া বলিল—আমি তোমাদের অভয় দিচ্ছি, এখন থেকে তোমরা সকল সময়েই আমার কাছেই তোমাদের সুখ-দুঃখের কথা

জ্ঞাপন করবে।—সে পাল্কীতে উঠিতেই, মহেশ মোড়ল চীৎকার করিয়া বলিল—জয় হোক মা,—তোমার জয় হোক!

এই অমৃত পান করিয়া অভয়া যখন গ্রামের পথে ফিরিতেছিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে কখনও কোন দিনই তাহার কোন দুঃখ ছিল না বা থাকিবে না!

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অভয়ার মনে হইতেছিল, সে তাহার পিতার নিকট শুনিয়াছিল, কোন এক সুপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার একখানি উচ্চাঙ্গের নাটক লিখিয়া লেখনীকে চির বিশ্রাম দিয়াছিলেন; কেহ কারণ জানিতে চাহিলে বলিতেন, কি জান, ও-টা যেমন সুযশ কিনেছে, পরের বইটা যদি তেমন না পায়! সেই ভয়েই আর লিখি না। অভয়া ভাবিতেছিল, আজই যদি তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত হয়, সে-কি সুখেরই হয়! প্রজার সভক্তি-জয়গান সে স্বকর্ণে শুনিয়া আসিয়াছে, তাহার সমস্ত জীবন আজ যেন সেই মুহূর্ত্তে সার্থক হইয়া গেছে। আজ আর তাহার কোন অভাব নাই, কোন দুঃখ নাই!

দূর হইতে প্রাসাদোপম অট্টালিকার পানে চাহিতেই সে বলিয়া উঠিল—উঃ কি অন্যায়ই হতে যাচ্ছিল। দেব-ভবনকে সমস্ত লোকের অভিশাপের মত দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলুম। যাক্, পরম নিশ্চিন্ত! পরম নিশ্চিন্ত!

ফটকের সামনে দুইতিনটা লোক জটলা করিতেছিল, দৃষ্টি পড়িবামাত্র অভয়ার চক্ষু যেন অবশ হইয়া গেল! ইহা কি কখনো সম্ভব হইতে পারে! অথচ এই দীর্ঘ দেহ, উন্নতকায় লোকটি যে আর কেহই নহে, ইহা সে নিশ্চিৎ বুঝিল। দূর

হইতেই সে শুনিল, রমেশ বাবু বলিতেছেন—কখন ফিরবেন? আমরা কেউ জানি না। এখন দেখা কোনমতেই হতে পারবে না।

লোকটি কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য অভয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিল। লোকটি বলিল—আমি অপেক্ষা করব। আমার যে দরকার, ফিরে যাওয়া চল্‌বে না।

রমেশ বাবু কি বলিতেছিলেন, বেহারা হাঁকিল, খবর্দ্দার!

প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, কোন কথায় কান দিবে না। রমেশ বাবুর সঙ্গে যে ক্ষুদ্র বচসা হইয়া গিয়াছিল, কোনমতেই সেই প্রসঙ্গকে জাগাইয়া তোলা উচিত হইবে না ভাবিয়া সে নীরব হইয়াছিল, কিন্তু লোকটির কথা শুনিয়া, সে বেহারাকে থামিবার ইঙ্গিত করিল।

এক মুহূর্ত্তে এককাণ্ড ঘটিয়া গেল। অভয়া দুই হস্তে পাল্কীর দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িতেই রমেশবাবুর মুখ পাংশু হইয়া গেল। দ্বারবান সসম্ভ্রমে সরিয়া অভিবাদন করিল, নিখিল আশ্বস্ত হইল। সব শুদ্ধ একটা কাণ্ড হইয়া গেল। তার চেয়েও হইল কাণ্ডটা এই, লোকটি অভয়াকে দেখিয়াই পুলকে দিশেহারা হইয়া বলিয়া উঠিল—এই ভাবছিলুম আমি, এলাম দরকারে, আর তোমার দেখা পাবো না! এ কেমন?

অভয়া কোনদিকে না চাহিয়াই বলিল—আসুন।

নিখিল নিঃশব্দে অনুসরণ করিল। একটা ঘরে তাহাকে বসাইয়া বলিল—পাঁচ মিনিট আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কাপড়টা বদলে আসি।

জানেলা দিয়া নিখিল দেখিল, দ্বারবান সমেত রমেশবাবু ফটকের সামনেই দাঁড়াইয়া আছেন, রাগে তাহার মুখখানা পোড়া হাঁড়ীর তলার মত হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া সে একটু খানি হাসিয়া চেয়ারে বসিল।

বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া অভয়া শীঘ্র ফিরিতে পারিল না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ যে আবার এমন করিয়া আসিবে, কে জানিত! এক রকম ত চুকিয়াই গিয়াছিল; আবার কিসের ছলে এখানে আসিল, কে জানে! সে যখন শুনিবে, তাহারই প্রদর্শিত পথে আমাকে চলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে, আমার দোর্ব্বল্যে সে কি খুব হাসিবে না? আর রমেশ দা! না জানি সে কি বিশ্রীই না কল্পনা করিয়া বসিবে। ইচ্ছা হইল, এইখান হইতেই খবর পাঠাইয়া দেয়, সে বাহির হইতে পারিবে না, কিন্তু ইচ্ছার প্রাবল্যস্বত্ত্বেও যে মানুষকে তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে হয়, ইহার পূর্ব্বে সে জানিত না। কোন্ অজ্ঞাত শক্তি তাহাকে নিখিলের সম্মুখে হাজির করিয়া দিল।

নিখিল বলিল—বস।

অভয়া ক্ষিতিতলন্যস্ত নেত্রে নীরবে বসিয়া রহিল।

নিখিল কোন ভূমিকা না করিয়াই বলিল—আমরা কাশী যাচ্ছি।—মাতা ও পুত্র!

অভয়া অবাক হইয়া তাহার মুখ চাহিতেই বলিল—জীবনে কারুর কোন কাজে লাগাই আমার অদৃষ্টে ঘটে উঠল না। মা আমার কোনদিনই আমার জন্য সুখী হ'তে পারেন নি। তাই তাঁর এ আদেশ পালন করতে একটুও বিলম্ব করতে সাহস হচ্ছে না।

অভয়া বলিল—আপনার আরন্ত কার্য্যের শেষ দেখে যাবেন না?

কি কাজ! আমার ত কোন কাজই নেই।—বলিয়া সে একটি নিঃশ্বাস ফেলিল।

আমার প্রজাদের মধ্যে যে বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়েছেন—

নিখিল সাতিশয় বিস্মিতকণ্ঠে কহিল—বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়েছি, আমি, অভয়া! এ কথা তুমি মনের সঙ্গে বলছ? না, না, যখন মনে উঠেছে, গলার মধ্যে তা'কে দমন করলেই কি নিষ্কৃতি পাবে, ভেবেছ?

অভয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—আপনি কি মনে করেন?

নিখিল একবার মাত্র অভয়ার পানে চাহিয়া বলিল—না, অভয়া, আমার মন বল্‌ছে, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর নি বলেই জোর করে, আমার কাছে বল্‌তে পারলে!

একটুখানি চুপ করিয়া, সে বলিতে লাগিল—ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে তাই মনে হয় বটে! আমি বিরোধই করতুম অভয়া, যদি না বুঝতুম, তা'তে সুখ নেই।

অভয়া কোন কথা কহিল না।

নিখিল কহিল—এক মা'কে ছাড়া দুনিয়ায় কা'কেও আমি অসুখী করি নি, তোমাকেও, না, করব-ও না। আমি মাতাল, অসচ্চরিত্র এ সব কথা যে তুমি না শুনেছিলে, তা নয়; তবু একদিনের তরেও ত কৈ এতটুকু অবহেলা তুমি আমাকে কর নি, অভয়া! তোমার এতখানি বিশ্বাসের বিনিময়ে আমি তোমাকে অসুখী করব—এ যে আমি ভাবতেও পারিনি!

অভয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—কিন্তু মার কথা কি বলছিলেন—যে!

হ্যাঁ। সে অপরাধের সীমা নাই, কিন্তু তার প্রতীকার করবার সাহসও আমার নেই অভয়া। আমার একটা অসীম তৃপ্তি আছে, যাদের সঙ্গে জীবনে মিশেছি, আমার সৌভাগ্যক্রমে কারুর অপ্রিয়ই আমাকে হতে হয় নি। অবশ্য, মহিলা সমাজে আমি মিশি নি, সে সুযোগই আমার হয় নি; তাঁদের সুমুখে যেতে আমার দ্বিধা সঙ্কোচের কোন দিনই অভাব ছিল না। বাহিরের মধ্যে, একবার, সে অনেকদিন আগে, মা একটি ছোট মেয়েকে বাড়ীতে এনেছিলেন এবং সে যে ভবিষ্যতে

তাঁর পুত্রবধূর গৌরবময় পদটি অধিকার করবে, এ-ও তা'কে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মেয়েটি আমাকে দেখে কেঁপেই অস্থির। একে সে অনেকদিন ধরে, ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল তার ওপর এই পাঁচহাত লম্বা মানুষটার মোটা গলা শুনে বেচারা কেঁদে ফেলেছিল।—তার সঙ্গে মা'ও আমার কেঁদে সারা

অভয়া হাসিয়া ফেলিল।

নিখিল বলিল—একদিন তুমি আমাকে বলেছিলে, প্রতিবাদ করলেন না কেন? আমি সেই মুহূর্ত্তেই এ ইঙ্গিতটি বুঝেছিলুম আমার মদ্যপ অপবাদ শুনে তুমি যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হওনি, তদ্দণ্ডেই আমি জানতে পেরেছিলুম। আমি বলেছিলুম প্রতিবাদ করতে হ'লে একদিন হয়ত তোমার সুমুখেও হাজির হ'তে হ'বে। তুমি যদি প্রথম থেকেই ঘৃণা করতে, আমি ত দ্বিতীয়বার মুখ দেখাতুম না, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করতে আসবার মত অবস্থাও আমার হ'ত না। তুমি ত আমাকে ঘৃণা করনি অভয়া!

অভয়া নীরব। সে কি বলিবে! বাধা দিবার শক্তি তাহার ছিল না।

নিখিল বলিতে লাগিল—মা'র দুঃখ দূর করবার হাত আমার যথেষ্টই আছে, কিন্তু—

অভয়া বলিল—আবার কিন্তু কি? তাঁকে সুখী করার চেয়েও বড় কার্য্য আপনার আছে?

নিখিল সোৎসাহে কহিল—তা'হলে প্রথমেই তোমার কাছে আমায় প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াতে হয়।

উত্তাল তরঙ্গের উপরে ক্ষুদ্র তরণীর মতই অভয়ার বক্ষ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। সে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল—আমি প্রজাদের বিরোধ দূর করে দিয়েছি। তাদের সমস্ত অভাবই আমি মিটিয়ে দিয়েছি।

নিখিল চেয়ার ছাড়িয়া দুই হাত তুলিয়া বলিল—কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও। এই ত চাই। তোমার সন্তানদের জানতে দাও, অভয়া, যে তুমি তা'দের মা; সম্পদে বিপদে, সুখে, দুঃখে তুমিই তাদের জননী, তারা তোমার সন্তান।

আনত আননখানি জলে ভাসিয়া গেছে, নিখিল কখন বসিয়া পড়িয়াছে, অভয়া কিছুই জানিতে পারে নাই। যখন সে চোখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল নিখিল একান্তে তাহার পানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছে।

নিখিল বলিল—তোমাকে যে আমি কতদূর শ্রদ্ধা করি, অভয়া, তা আমি বলতেই পারি নে। কেন করি, কখন্ থেকে করি, এ সব আলোচনা আমি কোন দিনই করতে পারি নি। আমি কবি নই, এবং বিদ্যেও আমার যথেষ্ট নয় যে সব কথা গুছিয়ে বলতে পারব;—তবে এটুকু বল্‌তে পারি, তোমাকে শ্রদ্ধা

করি বলেই তোমার কাছে প্রার্থনা করতে আমার কুণ্ঠা হচ্ছে, পাছে তোমার মর্য্যাদা আমি ক্ষুন্ন করি।

অভয়া মাটীতে চোখ রাখিয়াই বসিয়া রহিল। না জানি লোকটি কি বিষম প্রার্থনাই করিয়া বসিবে! তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া ফেলিতে হইবে, নিজের মনেই অভয়া তাহার স্পষ্ট আভাষ পাইতেছিল।

নিখিল উঠিয়া দাঁড়াইল, অভয়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল —মার মত দুষ্প্রাপ্য জিনিষেই যে আমারও লোভ জন্মাবে, তা আমি আগে ভাবিনি, অভয়া! মা'র ত বিলক্ষণ বিশ্বাস— তাঁর আশা একেবারেই অসম্ভব নয়, কিন্তু সে কথা ভাববার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই।

যাঞ্ঝা যথেষ্টই স্পষ্ট হইয়াছিল, তথাপি অভয়া অন্য একটা কিছু ভাবিয়া ক্ষণেকের মত বিমনা হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

নিখিল বলিল—বল অভয়া, মা'কে সুখী করিবার এই মহা-সুযোগ থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করবে না?—বলিয়াই সে অভয়ার দক্ষিণ হস্তখানি তুলিয়া লইল।

চোখের জলের শেষ ধারাটা এই হাতেই সে মুছিয়াছিল, হাত আর্দ্র দেখিয়াই নিখিল বলিল—তবে আমার আশা একান্ত দুরাশা নয়, অভয়া!—বলিয়া সে সোল্লাসে অভয়ার হাতটি টিপিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।



অভয়ার মনে হইল, সেও ঐ সঙ্গে উঠিয়া যায় এবং তাঁহারই অনুসরণ করে!—তখনি রামহরি আসিয়া বলিল—মা, রমেশবাবু কল্‌কাতা যাচ্ছেন।

কক্ষের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অঞ্চল প্রান্তে চোখের কোণ মুছিয়া অভয়া বলিল—যাবার আগে আমার সঙ্গে কি দেখা করবেন?

রমেশবাবুর সংবাদ রাখিতে রামহরির কোন দিনই উৎসাহ ছিল না, আজও নাই। বলিল—কি জানি মা। সোণাগাঁর জমিদার বেরিয়ে যেতেই আমাকে বল্লেন খবর দে।

অভয়া দৃপ্তস্বরে কহিল—আস্‌তে বল্‌।

রামহরি বাহিরে যাইতেই, অভয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অদূরে পদশব্দ শুনিয়া সে পাশের একটা দরজা দিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। রমেশ বাবু ঘরে ঢুকিয়াছেন এবং তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন জানিয়া, সে সেই সিন্দুকটা খুলিয়া কতকগুলা কাগজ-পত্র কাপড়ের নীচে চাপিয়া এ ঘরে ঢুকিতেই, রমেশ বাবু অন্যদিকে মুখ করিয়া কহিলেন, আমি কলকাতা যাচ্ছি।

ইহা যে অনুমতি লওয়া, তা নয়—বুঝিয়াই অভয়া কোন কথা কহিল না। রমেশ বাবু অধিক বিরক্ত হইয়া কহিলেন—কলকাতা যাচ্ছি আমি আজ!

অভয়া জিজ্ঞাসিল—আজই যাচ্ছ?

অপ্রসন্নমুখে রমেশ বাবু বলিলেন—হ্যাঁ। মাকে কিছু বলবে?

অভয়া বলিল—না, কালই আমি মাসীমাকে চিঠি লিখেছি—আর বলবার কিছু নেই।

রমেশ বাবু বলিলেন—প্রভাত এখনও কলকাতায় আছে, মা লিখেছিলেন। শীঘ্রই বোধ করি সে রেঙ্গুনে প্র্যাক্‌টিস্ করতে যাবে।

অভয়া মাথাটা নীচু করিয়াই বলিল—না, তিনি ব্যারিষ্টারি করবেন না। তার চেয়েও বড় কাজের ভার তিনি নিয়েছেন—তিনি স্বদেশের সেবা করবেন। আদালতে দাঁড়িয়ে দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করবার ইচ্ছে তাঁর নেই। কেন—তুমি কি এ খবর জান না?

রমেশ বাবু সে কথার উত্তর দিলেন না। মুখখানা বিশ্রী করিয়া কহিলেন—নাই-বা করল ব্যারিষ্টারি। তার পয়সার দুঃখু নেই। কম করে পঞ্চাশ লাখ্ টাকা সে পেয়েছে জান?

তা আর জানিনে। আর না জানেই বা কে? সমস্ত টাকা যে তিনি এক দানপত্রে ভারত-স্বেচ্ছাসেবক মহামণ্ডলীকে দান করেছেন। এ সব কথা ত আগেই কাগজে বেরিয়ে গেছে, তুমি কি কিছুই জান না? জান বোধ হয়?

রমেশ বাবু কি-রকম হইয়া বলিলেন—সেই জন্যেই বুঝি প্রভাতের আর সম্মান নেই?

এ কথায় অভয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল, মুখ চোখ রাঙা করিয়া বলিল—সম্মান নেই! এত অল্প বয়সে এত বড় ত্যাগ আর কেউ বাংলা দেশে করেছে কি-না আমার ত তা জানা নেই।

রমেশ বাবু বলিতে যাইতেছিলেন—তবে—

অভয়া কথা বলিবার কোন অবসর না দিয়াই কহিল—তিনি আমাকেও চিঠি লিখেছেন।

রমেশ বাবু ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন—প্রভাত তোমাকে?—চিঠি লিখেছে?

কেন?—তিনি ত লিখেছেন, তোমাকেও পত্র দিয়েছেন।

রমেশ বাবুর মুখ পাংশু হইয়া গেল। কিন্তু সব সময়েই সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত ক্ষমতা রমেশ বাবুর ছিল। তিনি এক মিনিট স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন—তা হলে এতদিন প্রভাতকে মিথ্যে আশা দিয়েই রেখেছিলে, কি বল?

অভয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—মিথ্যে আশা দিয়ে আমি রেখেছিলুম! রমেশ দা, তুমি কি! মানুষের চামড়া ত তোমার নেই, বোধ করি পশুর ছালও তোমার গায়ে নেই। নইলে এত বড় মিথ্যে তুমি বল কেমন করে!

রমেশ বাবু দৃপ্তস্বরে কহিলেন—এর মিথ্যে কোন্‌খানটা শুনি?

কোন্‌খান্‌টা? এর সবটাই মিথ্যে নয় কি? এ সম্বন্ধ কে

করেছিল? না আমি, না তিনি—কেউইত কিছু জান্তুম না; তোমরাই একদিন হঠাৎ বল্লে—

দু'মিনিট থামিয়া অভয়া আবার বলিল—তোমরাই বল্লে—প্রভাত আমাকে চায়! আমি ভাবলুম, হয় ত বা সত্যিই। কিন্তু তাত না,—গোড়া থেকেই তোমরা মিথ্যে বলেছ। তোমাদের কথার মধ্যে যদি এতটুকু সত্য থাকৃত, তিনি কথনই লিখ্‌-তেন না—বলিয়া অভয়া ড্রয়ার খুলিয়া একখানা পত্রের কতকাংশ রমেশ বাবুর সাম্‌নে মেলিয়া ধরিল।

রমেশ বাবু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেটুকু পড়িয়া ফেলিলেন—

আমি জানি না, ভগ্নি, ইহা সত্য কি-না! যদি সত্য হয—আমি অন্তরে কত যে বেদনা পাচ্ছি তা আর কি বলব। কিন্তু অভয়া, কোন প্রলোভনেই যে আমি স্বদেশের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারছি না। সর্ব্ব-সময়েই আমার মনে হয় দুঃখদৈন্য প্রপীড়িত স্বদেশ আমার, তার প্রত্যেক সন্তানেরই মুখ চেয়ে করুন নয়নে দীর্ঘশ্বাস ফেলচেন। রমেশ আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখ্‌চে, তুমি শীঘ্র কলকাতা আস্‌বে, তাও আমি জানি অভয়া, রমেশ এ সবও আমাকে লিখেছে—সে তোমার ওখানে কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকৃবে, আস্‌তে পারবে না, ভবিষ্যতে বিষয়-আশয় সেই দেখ্‌বে—এ সবও লিখেছে—তোমাকে কলকাতায় রেখে সে ফিরে যাবে, আর তুমি না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি যাতে কোথাও না

যাই, বিশেষ করে সে অনুরোধও করেছে কিন্তু আমি তার আগেই কলকাতা ত্যাগ করব। তুমি আমাকে মাপ কর।"

রমেশ বাবু পত্রপাঠ শেষ করিবা-মাত্র অভয়া জিজ্ঞাসিল—কি মনে হয়?

রমেশ কহিলেন—আমাদের দলে অন্য ব্রাহ্ম সুপাত্রের অভাব কি অভয়া?

'দল' শুনিয়া অভয়ার গা জ্বলিয়া গেল। কিন্তু সে সহজ সুরেই কহিল—আর আমি কিছুই বলবো না। তুমি মাসীমাকে ওই কথাই জানিও।

—বলিয়া সে কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নিখিল রাত্রে আহার করিতে বসিলে, সৌদামিনী বলিলেন—হঁ্যারে, অভয়া মত বদলেছে? শুনলুম, সে, তোর রায়ই বহাল রেখেছে?—

নিখিল বলিল—হঁ্যা মা।

সৌদামিনী বলিলেন—সে আমি আগেই জানতুম। সে কি তেমনি মেয়ে—

ছেলে কোন কথা কহে না দেখিয়া, অবশেষে কালই যাহাতে বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে রওনা হইতে পারেন, নিখিলকে সেই অনুরোধ করিলেন। নিখিল নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া অব্যাহতি পাইল।

পরদিন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সৌদামিনী আহার করিতে বসিয়াছেন, অভয়া আসিয়া বসিল, বলিল—আমি খেয়ে আসি নি, মা।

সৌদামিনী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পাচককে ডাকিতেই অভয়া বলিল—ঠাকুরের রান্না খেতে ত আসি নি, মা। তোমার প্রসাদ খাব বলে ছুটে এলুম।

সৌদমিনী বলিলেন—আর মা! আমি মা অন্নপূর্ণার রাজ্যে চল্লুম, যদি তাঁর প্রসাদ দু'টি পাই।

অভয়া বলিলেন—আমি ছুঁলে কি তোমার খাওয়া নষ্ট হ'বে মা?

সৌদামিনী বলিলেন—সে কি মা! তুমি ছুঁলে খাওয়া নষ্ট হ'বে কেন?

অভয়া সৌদামিনীর চরণদ্বয়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিল—দাও মা, তোমার পাতের দু'টি প্রসাদ দাও। অনেক দিন পাতে খাই নি।

সৌদামিনী অন্নের অংশ তুলিয়া দিতে দিতে ভাবিলেন—এই সময় অন্ধ-নিখিল একবার আসিয়া পড়িলে, তবেই তাহার চোখ খুলিয়া যাইত।

যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, দূর দেশস্থিত প্রিয়জনের স্মরণে প্রিয়জন তাহা জানিতে পারে, অথবা নাম করিলে সে 'বিষম' খায়, তাঁহাদের বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহাও অসম্ভব নহে। সৌদামিনীর স্মরণমাত্রেই নিখিল আসিয়া ডাকিল—মা!

সৌদামিনী ব্যতিব্যস্ত হইয়া কহিলেন—ও নিখিল, আমার অভয়া এসেছে-যে!

এসেছে!

নিখিলের মুখে এই সাধারণ 'এসেছে' শুনিয়াই সৌদামিনীর চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন—হ্যাঁ গো এসেছে। সে তোমার থানাবাড়ীর রেওৎ নয় যে এসেছে বল্লেই মিটে গেল।

আমিই যে তাকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি, মা।—বলিয়া নিখিল হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। দ্বারপ্রান্তে আর দুইটি সলজ্জ চোখের ছায়া তাহার চিত্তাকাশে ধ্রুবতারার মত ফুটিয়া উঠিল।

সৌদামিনী ঘরের দিকে চাহিতেই, অভয়া লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গিয়াছিল।

বহুদিন পৃথিবীতে বাস করার অভিজ্ঞতা এই দুইটি তরুণ-তরুণীর অপেক্ষা সৌদামিনীর অনেকাংশেই বেশী ছিল, তিনি দুই হাতে অভয়াকে জড়াইয়া ধরিলেন। বারবার তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন—আয় মা, অভয়া! আমার সংসারে অভয় দিতে একমাত্র তুই-ই পারবি!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বাবা বিশ্বেশ্বরের বেদীতে সকাল সন্ধ্যা মাথা ঠুকিয়া অন্নপূর্ণার রাজ্যে বাস করিবার উৎসাহ সৌদামিনীর একেবারেই দেখা গেল না। কাশীবাস করিবার মত বয়স তাঁহার হয় নাই বলিলে তিনি যথেষ্ট উষ্ণ হইয়া উঠিতেন, তবে তাঁহার পুত্র-পুত্র-বধূকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠ না করিয়াই বা তিনি বাহির হন কি করিয়া! বাড়ীতে বসিয়াই তিনি এই বলিয়া প্রত্যহ বিশ্বেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন—হে বাবা! এইবার একটি সোনারচাঁদ কোলে দাও, দেখে ইহজন্মের সাধ পূর্ণ করি।

বিশ্বেশ্বর যেখানেই থাকুন, সৌদামিনীর প্রার্থনা বিফল হইবে না—বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস এবং ইহাও আমরা স্থির জানি, রমেশ বাবুর 'দল' হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় রমেশ বাবুর অভিসম্পাতগুলি সৌদামিনীর বিশ্বেশ্বর-ভক্তির জোরেই বিষহীন বিষধরের মতই নিষ্ফল হইয়া পড়িবে। অভয়ার কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না। এবং অতি বড় বিস্ময়ের কথা হইলেও ইহা একান্ত সত্য যে রমেশবাবু প্রভাত প্রদত্ত পুষ্পমালা একগাছি বহন করিয়া সোনাগাঁয় আসিয়া চাকুরী স্বীকার করিলেন। বাজীৎপুরে নয়, সোনাগাঁয়েই। নিখিল তাঁহার হাতে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া কহিল—রমেশ-দা, বেশী দিন নয়, বছর দুই আমাদের ছুটি!

রমেশবাবু তাহাতেই রাজী হইলেন এবং প্রভাতের লেখা পত্রখানি অভয়ার হাতে দিয়া কাজের বাড়ীর কাজকর্ম্মে মিশিয়া গেলেন।

প্রভাত লিখিয়াছিলেন অভয়া, তোমার নিঃস্ব ভ্রাতা দেশের গাছের কয়েকটি ফুলের মালা গাঁথিয়া এই শুভদিনে তাহার শুভেচ্ছা প্রেরণ করিতেছে। শুনিয়াছি, সে দেশের রাণী তুমি, বৌ-রাণীকে কত লোকে কত হীরামুক্তা যৌতুক দিবে, কিন্তু আমার যে আর কিছুই নাই বোন্। অম্লান এই পুষ্পমাল্য কি তোমার কণ্ঠে শোভা পাইবে না? প্রভাত।

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সেরাত্রে নিরাভরণা অভয়ার কণ্ঠে সেই অম্লান পুষ্পমাল্যই একমাত্র হীরক-হারের মত জ্বলিয়াছিল।

সম্পূর্ণ।



কয়েকখানি বঙ্গ সাহিত্যের নিদর্শন।

১৷০	দামের	পল্লী-সংসার	...	নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৷৷০	,,	প্রাণপ্রতিষ্ঠা	...	বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৲	,,	পাষাণী	...	সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
১৲	,,	মহিমা-দেবী	...	শৈলবালা ঘোষজায়া
১৷৷০	,,	তপস্যার ফল	...	ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৲	,,	দরদী	...	সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৷৷০	,,	সমাজ-বিপ্লব	...	নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৲	,,	বড় ছোট	...	নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৷৷০	,,	একাল সেকাল		,,
১৷৷০	,,	পুণ্যস্মৃতি	...	,,
১৷৷০	,,	সিঁথির সিঁদুর	...	,,
১৷৷০	,,	সোনার সংসার	...	নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৷৷০	,,	পল্লীরাণী	...	ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৲	,,	ব্রতকথামালা		শ্রীহরিশ্চন্দ্র মজুমদার
১৲	,,	দীপালি	...	হেমেন্দ্রমোহন বোস
১৲	,,	লক্ষ্মীর-কৌটা	...	নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৲	,,	বিয়ের-ক'নে	...	প্রফুল্লচন্দ্র বসু
১৲	,,	বৌ-রাণী	...	বিজয়রত্ন মজুমদার
১৲	,,	জন্ম-এয়োস্ত্রী	..	শরৎচন্দ্র পাল
১৲	,,	চরকার উৎসব		সরসীবালা বসু
১৲	,,	মণিবেগম	...	দুর্গাদাস লাহিড়ী
১৷৷০	,,	কালো-বৌ		শরৎচন্দ্র দাস
১৷৷০	,,	ভাগ্য-লক্ষ্মী	...	সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
১৲	,,	শুভ-দৃষ্টি	...	যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য
১৷৷০	,,	নিষ্কৃতি	...	নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৲	,,	দুর্গা মর্ত্ত্যে আগমন	—	অমরেন্দ্রনাথ রায়